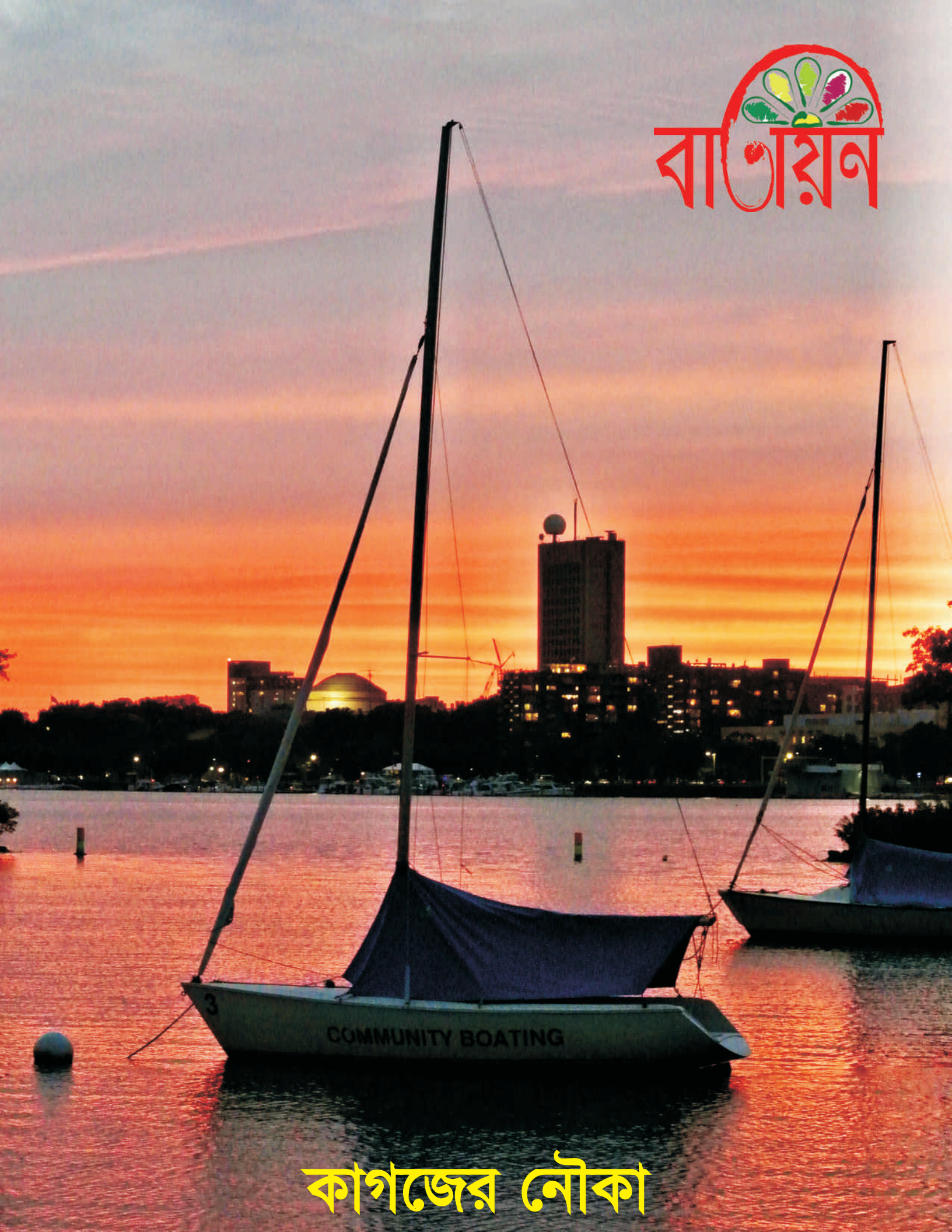

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

বাতায়ন

নতুন ভুবনের পারে

Durba

Srijato

Tanmoy

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২১তম সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

বাতায়ন

Issue Number 21 : November 2022

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Suvra Das **Front Cover**

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

Saumen Chattopadhyay **Title Page**
IL, USA Venice is pretty

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

বারোশো শতকের ইতালির দার্শনিক থমাস অ্যকুইনাস বলেছিলেন "If the highest aim of captain were to preserve his ship, he would keep it in port forever", কিন্তু বস্তুত তা সম্ভব নয়, নয় বলেই পসরা নিয়ে ঢেউ ভেঙে তরী এগিয়ে চলে বন্দর থেকে বন্দরে। ২০২২ এর শেষ কাগজের নৌকা এসে ভিড়লো বাতায়নের পাঠকদের মনের খেয়াঘাটে তার গল্প উপন্যাস ও কবিতার সংগ্রহ নিয়ে, বরাবরের মতো। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র করার যে প্রচেষ্টা বাতায়ন করে চলেছে, কাগজের নৌকার প্রতি পাঠকের ভালোবাসা তাকেই নির্ণয় করে।

বাতায়ন প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার একটি বিশেষ মঞ্চ। সেই প্রয়াসে অংশ নিচ্ছেন কবি, সাহিত্যিক ও নিবিষ্ট পাঠকেরা। সম্প্রতি সিডনি ও পার্থে হয়ে গেল বাতায়নের সাহিত্য অনুষ্ঠান। যোগ দিতে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় উড়ে এসেছিলেন কবি শ্রীজাত, কবিজায়া দূর্বা বন্দোপাধ্যায় ও কবি তন্ময় চক্রবর্তী। সিডনির পেনান্ট হিল কম্যুনিটি সেন্টারে শনিবারের বিকেল ছিলো তিন ভুবনের পারে দাঁড়িয়ে, সাহিত্য জগতের তিন সমুদ্রের গভীরতায় বিস্মিত হওয়ার বিকেল। কবিতা, শ্রুতিনাটকে জমজমাট সন্ধ্যা। প্রিয় লেখকদের কাছ থেকে পাওয়া, আলাপ, তাদের কথা শুনতে পাওয়াও ছিল প্রাপ্তির।

পরের দিন ছিলো কবিতার কর্মশালা, সারা দিন ধরে। কবিতা কেন হয়? কিভাবে হয়? কখন সে আসে? কিভাবে ছন্দ ও মাত্রার প্রয়োগ কবিতাকে নির্মাণ করে? এই নিয়ে ছিলো বিশ্লেষণমুখী অথচ জমাট আলোচনা সারাদিন। বিদেশে বসবাসরত বাঙালিরা কিভাবে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে, সময়কে ধরে রাখছেন লেখার মধ্যে, কবিদের কাছে তা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এখানেই বাতায়নের মূল মন্ত্র "প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা"। সেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন সিডনি ও পার্থের পাঠক ও শ্রোতারা, অনুষ্ঠানকে সফল ও উজ্জ্বল করার মধ্য দিয়ে। আমেরিকান লেখক জন রুসমানিয়ের বলেছেন "the goal is not to sail the boat, but rather to help the boat sail herself"। বাতায়নের কাগজের নৌকাও তাই ভাবে। সকলের ভালোবাসায় ভেসে সে পৌঁছে যাক পাঠকের মনের কাছে।

সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এটাই কাম্য।

নমস্কার।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	**ছায়া সীমানা**	5
সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	**চল নিধুবনে**	22
সৌমিত্র চক্রবর্তী	**সময়**	51
শকুন্তলা চৌধুরী	**পরবাসী**	62

কবিতা

তপনজ্যোতি মিত্র	**এক মেঘপুরুষের জীবন**	49
পারিজাত ব্যানার্জী	**যুদ্ধ শেষের সন্তান**	50
	প্রেমের কপট অভিমান	50

প্রবন্ধ

স্বর্ণালী সাহা	**কলকাতার কেক বিলাস**	82

রান্নাবান্না

মহুয়া সেনগুপ্ত	**অন্নপূর্ণার হেঁশেল**	84

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া সীমানা

পর্ব ২

(৩)

আজ মাঘ মাসের এই শীতের দিনটিতে, গোধূলি লগনে সঞ্জয়েরও বিয়ে। বিয়ে উপলক্ষ্যে বাবা-মায়ের সঙ্গে সঞ্জয়দের বিরাট যৌথ পরিবারের অনেকেই কাশী এসেছেন। রম্‌দা প্লাজার পুরো একটা উইং ভাড়া নিয়ে ওঁরা এসে উঠেছেন।

বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানও হবে এখানেই। তা জন্য মস্ত দু'খানা হল এবং সংলগ্ন অ্যাল্‌ফ্রেস্‌কো ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

বিকেলবেলা শ্রীতমাকে কনে সাজিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন ওর মা, মামা, মামীমা আর মামাতো দুই ভাই। কনেপক্ষের বন্ধু-বান্ধবেরাও বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবে এখানে এসে।

সঞ্জয়ের মনে হল, ব্যাপারখানা বেশ এলাহি।

দধি-মঙ্গল এবং গায়ে হলুদ পর্ব চুকে যেতে, সঞ্জয়ের মা শান্তিময়ী ছেলেকে জোর করে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েও কিন্তু একটুও ঘুম আসছিল না সঞ্জয়ের। ভারতে ফিরে আসার পর, বিগত সাত-আট মাসের মধ্যে ওর জীবনে কতগুলো ঘটনা এমনি দ্রুত ঘটে গিয়েছে যে তাল রাখতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে চলেছে বেচারি সঞ্জয়।

আজ, এই মুহূর্তে, ওর মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে যে আজ সন্ধ্যায় বাস্তবিকই ওর বিয়ে হতে চলেছে! এবং এই বিয়েতে ও মত দিয়েছে!

অস্ট্রেলিয়া থেকে দিল্লি ফেরত যাবার সময়ে শর্মিলার স্পষ্ট, দ্বিধাহীন প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও কোলকাতায় এসেও তারই সঙ্গে পথ চলার আকাঙ্খাটা প্রাণপণে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছিল সঞ্জয়। মেঘের ওপর তখনো প্রাসাদ তৈরি করে চলেছিল শর্মিলা আর তার নিজের যৌথ ভবিষ্যতের পরিকল্পনায়। তার সব স্বপ্ন তখনো ছিল শর্মিলাকে ঘিরে। ঠিক যেমন শর্মিলার সঙ্গে দেখা হওয়া ইস্তক, মেলবোর্নে ছাত্রজীবনে তার শেষ দুটো বছর কেটেছিল, সেই মেয়েকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনে।

আসলে শর্মিলার প্রত্যাখ্যানকে হৃদয় থেকে কেনদিনই মেনে নিতে পারে নি সঞ্জয়। ওর বিশ্বাস ছিল, শর্মিলা একদিন নিশ্চয়ই মত পাল্‌টাবে। ফিরে আসবে সঞ্জয়ের কাছে। আর যতদিন না তার এই বিশ্বাস বাস্তবায়িত হয়, সঞ্জয় অপেক্ষা করবে। দরকার হলে আজীবন।

অথচ কোলকাতা ফিরে এসে অবস্থাটা এক নতুন মোড় নিল। বাড়িতে পাত্রীপক্ষদের নিরন্তর আনাগোনা আরম্ভ হয়ে গেল। সঞ্জয়ের মা শান্তিময়ী এবং বাবা নরেন্দ্রনাথ একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়লেন। অভিজাত বংশের অমন সুপুরুষ এবং কৃতী ছেলে পাত্র হিসেবে নিঃসন্দেহে অতিশয় বান্ছনীয়। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। পাত্রীপক্ষদেরই বা দোষ কি!

অতঃপর অনূঢ়া কন্যাদের পিতামাতার লাগাতার উপদ্রবের জের এসে পড়তে লাগল সঞ্জয়ের ওপর। সুন্দরী পাত্রীদের ছবি, বায়োডাটা, বংশ পরিচয়ের তালিকা নিয়ে প্রত্যহ ছেলের ঘরে হানা দিতে লাগলেন শান্তিময়ী।

ব্যাপারটা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠেছিল সঞ্জয়ের। অবশেষে রজতের স্মরণাপন্ন হয়েছিল সে। এক সন্ধ্যায়, কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে দেখা হয়েছিল দুই বন্ধুর।

শর্মির সঙ্গে ওর সম্পর্ক এবং বিচ্ছেদের ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে বলেছিল রজতকে। সব শুনে রজত বলেছিল, "হৃদয় আর মস্তিষ্কের হেভি ডুয়েল চলছে তোর মনে। হৃদয় বলছে, শর্মি, শর্মি, শর্মি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। কেউ থাকবে না আমার জীবনে। আর ওদিকে মস্তিষ্ক বলছে, শর্মি বলে তোমার জীবনে আর কেউ নেই। শর্মি ইজ আ ফ্লর্ট। শর্মি ইজ আনফেথফুল। তাই তো? যা না একবার দিল্লি। ওকে কন্‌ফ্রন্ট করে বল, মর রহা হুঁ, মর জাউঙ্গা। বদনাম তুঝে কর জাউঙ্গা। দ্যাখ না কি ভাবে রিঅ্যাক্ট করে তোর শর্মি"।

শেষ অবধি শর্মিলার সঙ্গে মুখোমুখি হবার অবকাশ অবশ্য আর ঘটল না সঞ্জয়ের।

দিল্লি রওনা হবার আগের দিন, নিতান্ত কাকতালীয় ভাবে মেলবোর্নের বন্ধু সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়ের। বিখ্যাত সেই কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসেই। শর্মিলার মত সিদ্ধার্থও দিল্লীতে মানুষ। আই. আই. টি. দিল্লি থেকে এম টেক্ পাশ করে, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ নিয়ে সে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল রিসার্চ করতে। সঞ্জয় তখন আন্ডারগ্র্যাড্ ছাত্র।

যথাসময়ে পি.এইচ.ডি শেষ করে সিদ্ধার্থ ফিরে গিয়েছিল স্বদেশে।

এই ক'টা বছর পর এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আবার সিদ্ধার্থর দেখা মিলতে, উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছিল সঞ্জয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে হাঁক ছেড়ে ছিল, "হায় দেয়ার সিদ্ধার্থ, এখানে কি করছিস ? হোয়াট্ আ সারপ্রাইজ"!

ডাক শুনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখেছিল সিদ্ধার্থ। সঞ্জয়কে দেখে ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠেছিল প্রথমটা। তারপর হন্‌হন্ করে এগিয়ে গিয়ে সঞ্জয়ের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলেছিল, "তুই! সঞ্জয়! কবে ফিরে এলি অস্ট্রেলিয়া থেকে? এখানেই আছিস নাকি আজকাল"?

– আমি ফিরেছি কয়েক মাস আগে। হ্যাঁ, আপাততঃ এখানেই আছি। যেখানে একটা চাক্‌রী পাব, সেখানেই চলে যাব", একটু থেমে সে আবার বলেছিল, "সিদ্ধার্থ, তুই এখন কোথায় ? কি করছিস কোলকাতায়"?

– আমি ব্যাঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ্ সায়েন্সে রিসার্চারের কাজ করি। অবশ্য দিল্লিতে আমার ঘন যাতায়াত, কারণ আমার বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা দিল্লির বাসিন্দা"। একটু থামল সিদ্ধার্থ। সঞ্জয়কে মন দিয়ে নিরীক্ষণ করল কয়েক মিনিট, তারপর সেই আগের মত ফিচ্‌কেল হাসি হেসে বলল, "আরে তু তো বড়া হো গয়া হ্যয় রে! লেকিন এখুনি যে বললি, যেখানে একটা চাক্‌রী মিলবে সেখানেই চলে যাবি! কেন রে! তু বৈরাগী হো গয়া হ্যয় ক্যা, ভাই? আখির কেঁও"?

ওর কথার ভঙ্গি দেখে সঞ্জয় হেসে ফেলেছিল।

সিদ্ধার্থ চোখ টিপে বলেছিল, "বাই দ্য ওয়ে, জানিস ম্যয় অভি অভি কঁহা সে ঘুম কর আয়া হুঁ?

– না তো!

– আরে, উও অপ্‌নি বিউটি কুইন যো থী না? উস্‌কি শাদী মে গয়া থা। গত হপ্তায় তো দিল্লিতে বিয়ে হ'ল সেই শর্মিলা বোসের।

হা ঈশ্বর! নিজের অজান্তেই পলকের জন্য দু'চোখ বুজেছিল সঞ্জয়। টের পেয়েছিল ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা জোরে লাফালাফি করছে। মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে বুক ফেটে তার হৃৎপিন্ড ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খাবে ওর পায়ের কাছে, মেঝের ওপর।

– কেঁও রে, তুঝে মালুম নহি থা ক্যা? বিয়ের দাওয়াত পাস নি তুই, শর্মিলা বোসের কাছ থেকে?

নীরবে মাথা নেড়েছিল সঞ্জয়। না, শর্মিলা বসুর বিয়েতে সে আমন্ত্রিত হয় নি।

– বোঝ্ তবে! আসলে তো বিউটি কুইন না, বল্‌কি বিল্‌কুল বিউটিফুল ডায়ন হ্যয় শর্মিলা। বেওফা ঔরত! এক সময়ে তো তোর ফ্লেম ছিল না?

সঞ্জয় নীরব।

সিদ্ধার্থ ক্রুদ্ধস্বরে বলে চলেছিল, "হালাকি, এক সময়ে তো ও আমারও প্রেমিকা ছিল। আবার, শুধু আমারই কেন, আরও অনেকের সঙ্গেই প্যার-মহব্বত ছিল ওর। বেহয়া ঔরত! যখন যাকে ওর জরুরত হ'ত তারই পিছনে পড়ে যেত!

– কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল শর্মিলার"? আস্তে জিজ্ঞেস করেছিল সঞ্জয়।

– আরে দিল্লি শহরেরই একজন বিগ্ মিডিয়া ম্যাগ্‌নেট। পলিটিকলি পাওয়ারফুল।

– চল্, আমরা কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি", সহসা প্রসঙ্গ পাল্‌টে বলেছিল সঞ্জয়। কিছুতেই সে সিদ্ধার্থকে তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় দেখতে দেবে না!

লোকে-লোকারণ্য কলেজস্ট্রীটের আকর্ষণ সঞ্জয় কোনদিন অস্বীকার করতে পারে না। ফুটপাথের ওপর সারি সারি বইয়ের পোর্টেব্‌ল্ দোকান। কোন বইপ্রেমী সেই সব দোকানের হাতছানি এড়াতে পারবে না। কতগুলো স্টলে আবার পুরনো, অর্দ্ধেক বা আরও কম দামে পাওয়া যাচ্ছে।

– "প্রাচীন দুর্লভ বইয়ের খোঁজে অনেকেই এখানে আসে", সঞ্জয় বলেছিল, "আর বেশীর ভাগই তারা নিরাশ হয়ে ফেরে না।"

বইয়ের দোকানগুলো পর্যবেক্ষণ করতে করতে ঘন্টাখানেক কেটে গিয়েছিল। গোটাকয়েক অ্যাপ্লিকেশন ম্যানুয়াল কিনেছিল সঞ্জয়। সিদ্ধার্থ কিনেছিল টুক্‌টাক্ স্টেশনরি আইটেম তার পড়ার টেবিলের জন্য।

সঞ্জয় প্লেনের টিকিট বাতিল করে দিয়েছিল পরদিন। তারপর আবার কফি হাউসেই দেখা করতে গিয়েছিল রজতের সঙ্গে।

কলেজ স্ট্রীট ত' শুধুমাত্র বইপাড়া নয়। কোলকাতা মেডিকাল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বেথুন কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ ছাড়াও এই অঞ্চলে অনেক স্কুল কলেজ থাকার সুবাদে কলেজ স্ট্রীটের পথে এবং এই কফি হাউসে নিরন্তর আনাগোনা অধ্যাপকদের, ছাত্রদের এবং আঁতেলদের। তাই কফি হাউসের স্যাঁৎস্যাতে, ভ্যাপ্‌সা পরিবেশের মধ্যেও প্রবহমান চিন্তাধারার স্রোত বিষণ্ন সঞ্জয়কে সেদিন স্পর্শ করেছিল।

– "কিংকর্ত্তব্যমতঃপরম", কফি হাউসের কুয়াশাভরা হাওয়ায় একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে রজত বলেছিল।

– কি বললি ?

– "ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম তুই যে আবার সায়েবসুবো হয়ে গিয়েছিস। সংস্কৃত আওড়ালে বুঝবি না", লঘুকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল রজত, "বল্‌ছি এবার কি করবি কিছু ভেবেছিস? হোয়াট ইজ ইওর নেক্‌স্ট্ স্টেপ গোয়িং টু বী"?

– জানি না," সঞ্জয় মাথা নেড়েছিল।

– জানি না বললে তো চলবে না, বন্ধু। তোকে জানতেই হবে যে।

– তুই কি করতে বলিস ?

কয়েক মিনিট গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল রজত। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, আবার সিগারেটে টান দিয়ে বলেছিল, "তোর সামনে এখন দুটো অপ্‌শন্‌। এক নম্বর অপ্‌শন্‌ সঞ্জয়দাস বনে গিয়ে, শর্মি, শর্মি বলে উচ্ছন্নের রাস্তায় এগিয়ে যাওয়া, আর দু'নম্বর অপ্‌শন্‌ হ'ল – এই আঘাতের ফলে ইস্‌পাতের মত শক্ত হয়ে আলোময় এক ভবিষ্যতের দিকে, শর্মিহীন এক নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। পুরুষসিংহ হয়ে ওঠা"।

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে থেমেছিল রজত। তারপর কফির মগে চুমুক দিয়ে বলেছিল, "এখন দ্য চয়েস ইজ ইওর্স"।

সাত আট দিনের মধ্যে সঞ্জয়ের দিকে ভাগ্য দেবী কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন অতঃপর। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়রিং ফ্যাকাল্টি থেকে অধ্যাপক পদে নিযুক্তির চিঠি পেয়েছিল।

শর্মিলার ব্যাপারটা বাড়িতে কাউকে বলে নি সঞ্জয়। ফিরে আসা অবধি বিয়ের জন্য মায়ের পীড়াপীড়ি ক্রমেই ওর জীবন দুর্বিষহ করে তুলছিল।

তাই নতুন চাকুরী-সূত্রে কোলকাতা বাসের পাট তোলাটা ভগবানের আশীর্বাদ মনে হল সঞ্জয়ের। কিছুকাল অন্ততঃ বিয়ের জন্য মায়ের ঘ্যানঘ্যানানি থেকে মুক্তি পাবে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সে।

(৪)

কাশী শহরের সঙ্গে মোলাকাত সঞ্জয়ের এই প্রথম। ওর হিন্দী ভাষাজ্ঞান সীমিত অথচ কাশীর আম জনতা হিন্দীভাষী এবং যথেষ্ট গোঁড়া। কোলকাতা থেকে এই নতুন জায়গায় এসে প্রথম প্রথম নিজেকে বিদেশী মনে হ'ত সঞ্জয়ের। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকজন বাঙালি আর হিন্দীভাষী সহকর্মীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এবং আসা-যাওয়া আরম্ভ হওয়ায়, একাকীত্ব কাটিয়ে অনেকটাই স্থিতু হয়েছিল সে। নতুন পরিচিতি, নতুন অবস্থান, এবং নতুন পরিবেশ। নতুন এক জীবনের ঠিকানা পেয়ে যেন পুনর্জন্ম হয়েছিল সঞ্জয়ের। অতীতের তিক্ততা অনেকটাই ধুয়েমুছে গিয়েছিল কয়েক মাসের মধ্যে।

স্বয়ং বিশ্বনাথের ধাম কাশী। তৈলঙ্গ স্বামীর সাধনা স্থান কাশী। আর মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রবহমান গঙ্গাও এই কাশীতেই। ছোটবেলায় সঞ্জয় শুনেছিল ঠাম্মার কাছে, কাশীতে মৃত্যু ঘটলে এবং মণিকর্ণিকা ঘাটে চিতায় উঠতে পারলে নাকি জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে আত্মা চিরতরে মুক্তি পায়। এই বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে অবশ্যই গ্যারান্টি দিতে পারে না সে। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শহর কাশীতে জীবনের নিরন্তর প্রবাহ দেখে তাক লেগে যায় সঞ্জয়ের। ফোটোগ্রাফির নেশা তার অনেক দিনের। কাশীর পথ-ঘাট, ঝাঁকে ঝাঁকে মন্দির, গঙ্গা আরতি, ভোরবেলা গঙ্গার বক্ষে ভাসমান নৌকো থেকে সূর্যোদয়, প্রাচীন ও আধুনিক জীবনশৈলির পাশাপাশি অবস্থান, পূর্ব ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলমিশ – অবসরের সময়ে সঞ্জয়কে টেনে বার করে আনে বাড়ি থেকে। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। ঘুরে বেড়ায় আনাচ কানাচ। এক সময়ে কোন একটা দোকানে ঢুকে পড়ে পুরি-তরকারি আর গুলাব জামুন খেয়ে নেয় পেট পুরে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে আসে।

অধ্যাপনা, রিসার্চ, ছবি তোলা, রান্না নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মাঝে মাঝে সহকর্মীদের বাড়িতে রবিবারের আড্ডা – এসব নিয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল সময়।

শর্মিলার কথা ভুলে গিয়েছিল এক সময়ে। আর ঠিক তখনি হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ফোন করলেন একদিন।

– সঞ্জয়, আমি আর তোর মা কাশী বেড়াতে আসছি, রে। পরশু – রওনা হচ্ছি আমরা।

– দারুণ খবর, বাবা! চলে এসো। কতদিন তোমাদের দেখি নি। দাদামণিকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। এখানে এলে ওঁরও একটা চেঞ্জ হবে। ভাল লাবে।

– নাঃ। এ যাত্রায় দাদামণির আসা হবে না। তবে তুই তো এখন ওখানেই আছিস। পরে একবার বাবাকে রাজী করিয়ে নিয়ে যাব'খন।

অতঃপর নরেন্দ্রনাথ আর শান্তিময়ী এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কাশীতে।

সঞ্জয় মাকে প্রথম দিনই বলেছিল, "তোমরা এসেছ বলে আমার খুব, খুব ভাল লাগছে, মা। তোমাকে, তোমার হাতের রান্না খুব মিস্ করি এখানে এসে যাবৎ"।

– আমাদেরও এখানে দারুন লাগছে রে বাবা। খুব ভাল লাগছে তোকে দেখে। দিব্যি গুছিয়ে সংসার করছিস তো! তুই যে এমন কাজের ছেলে তা আমার ধারণাতীত ছিল।

– "আমার কিন্তু একটা শর্ত আছে, মা", হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সঞ্জয় বলেছিল।

– "কি তোর শর্ত শুনি," হাসিমুখে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শান্তিময়ী।

– তুমি বা বাবা কেউ আমার বিয়ের কথা তুলবে না।

– ও মা, এ আবার কি রকম কথা!

– হ্যাঁ মা, প্লীজ। বিয়ে আমি এখন করব না। বিয়ে না করে বিন্দাস আছি। বিয়ে করতে আমাকে তোমরা বলবে না।

মায়ের সঙ্গে এই সংলাপের পর পরই ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে বাবা-মায়ের সাথে সঞ্জয়কেও যেতে হয়েছিল নিশিথ চ্যাটার্জীর বাড়ি, ওঁদের বিশেষ অনুরোধে।

বাড়ি ফিরে এসে শান্তিময়ী একবার ছেলেকে শুধিয়ে ছিলেন, "কেমন লাগল তোর বাবার বন্ধুর পরিবারটিকে"?

– ভালই। রান্নাগুলো দারুণ হয়েছিল।

– যমজ ছেলেদুটো? ওরা কেমন?

– চয়ন-চন্দন? বেশ মজার ছেলে ওরা। যেমন সজীব তেমনি ফাজিল। আর কি রকম বেগে হিন্দি বুলি ছোটে ওদের মুখে। অ্যামেজিং!

শান্তিময়ী হসে ফেলেছিলেন ছেলের কথায়। তারপর বলেছিলেন, "আর ওই মেয়েটা? শ্রীতমা? কেমন লাগল ওকে"?

সঞ্জয় চমকিত হয়ে বলেছিল, "আমার শর্তটা তোমার মনে আছে তো মা ? আমার বিয়ের চিন্তা মাথাতেও এনো না। আপাততঃ খুব ভাল আছি আমি বিয়ে না করে"।

বাবা, মা কোলকাতা ফিরে যাবার পর, দু-একদিন মনমরা হয়েছিল সঞ্জয়। মায়ের যত্ন, ছেলেকে আদর করে বুকে টেনে নেওয়া, মায়ের হাতের অতুলনীয় রান্নার কথা থেকে থেকে মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর। বাবার সঙ্গে জাঁকিয়ে বসে কত গল্পই না হ'ত। দুর্বলতার সেই মুহূর্ত্তগুলোতে মনে মনে স্বীকার করেছিল সঞ্জয়, বাবা-মা যদি পাকাপাকিভাবে এখানে চলে আসতেন। কিন্তু নাঃ, কোলকাতা ছেড়ে কাশীতে এসে থাকা ওদের কাছে অকল্পনীয়। একমাত্র ছেলের টানেও না! ওঁদের কথা ভাবতে ভাবতে বড় একা, বড় শূন্য লেগেছিল।

সেই সময়েই এক রবিবার ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে ও সারনাথ গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে শ্রীতমা এবং ওর বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

সেই সাক্ষাতের কয়েকদিন পর হঠাৎ কোলকাতার বাড়ি থেকে ফোন পেয়েছিল সঞ্জয়। ফোনের অপর প্রান্তে এবার ওর দাদামণি। দু'পক্ষের কুশল বিনিময়ের পর, দাদামণি বলেছিলেন, "সঞ্জয়, তুমি এবার বিয়ে করবে। তোমার বাবা-মা একটি সুলক্ষণা মেয়েকে তোমার জন্য পাত্রী স্থির করেছেন। মেয়েটি কাশীতেই থাকে এবং তোমার ইউনিভার্সিটিতেই পড়ে। শ্রীতমা ব্যানার্জী নাম তার"।

বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। সঞ্জয় যেন অকস্মাৎ আকাশ থেকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল দাদামণির কথা শুনে।

– কিন্তু দাদামণি, আমি এখন বিয়ে করতে মোটেই ইচ্ছুক নই", আম্‌তা আম্‌তা করে বলেছিল সঞ্জয়।

– খবর্দার বল্‌ছি," ওপার থেকে গর্জে উঠেছিল দাদামণির গলা, "যা বলছি ঠিক তাই করবে তুমি। শ্রীতমার সঙ্গে অতি সত্ত্বর তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করব আমরা"।

স্তম্ভিত হয়ে ফোন হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সঞ্জয় অতঃপর। দাদামণি এবার একটু নরম সুরে বলেছিলেন, "দ্যাখ্ নাতি, তুই তো জানিস তুই আমার কত গর্বের, কত আদরের জিনিস। আমার জীবদ্দশায় তোর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি বড় আনন্দ পাব। আমার কথাটা ফেলিস না"।

দাদামণির শেষ কথাগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত অনুনয় সঞ্জয়ের মনকে স্পর্শ করেছিল।

পরদিন আবার শান্তিময়ীর ফোন এসেছিল।

– সঞ্জু বাবা, লক্ষ্মী ছেলে আমার, তুই একবার শ্রীতমাদের বাড়ি ঘুরে আয়। ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর যদি তোর অপছন্দ হয়, আমি নিজে এই বিয়ে বাতিল করে দেব। কথা দিচ্ছি", শান্তিময়ী বলেছিলেন।

অসম্ভব রাগ হয়েছিল নিজের ওপর সঞ্জয়ের। উহ্ ! কেন যে শর্মির জন্য, শুধুমাত্র তারই জন্য, আমি অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে চলে এলাম, ও মনে মনে ভেবেছিল। ওখানে থেকে গেলে কেউ আমাকে এমন হেনস্থা করতে পারত না! সবার আওতার বাইরে আমি বিন্দাস থাকতাম। সবই আমার নিয়তি !

কিন্তু তাও, মায়ের কথা ফেলতে পারে নি সে। একদিন, শ্রীতমা ব্যানার্জী নামে সেই মেয়ের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, "কথাবার্ত্তা" বলতে।

সেদিন শ্রীতমার মা বাড়ি ছিলেন না। শ্রীতমা নিজে তার আসন্ন পরীক্ষার জন্য বেশ টেন্‌সনে ছিল। তবু, সঞ্জয়কে কফি বানিয়ে খাইয়েছিল এবং সহজ, সপ্রতিভ ভাবে কথাবার্ত্তাও বলেছিল।

ওখান থেকে ঘুরে এসে মাকে ফোন করে রিপোর্ট দিয়েছিল সঞ্জয়, "তোমাদের ঠিক করা পাত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে এসেছি আজ"।

– "কেমন দেখলি, বল্ না"? শান্তিময়ী ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

– "চল্‌বে", শান্ত, নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিয়েছিল তাঁর ছেলে।

– এ বিয়েতে তোর আপত্তি নেই তো?

– "নাহ্", বলেছিল সঞ্জয়, "দাদামণি যখন বলেছেন বিয়েটা আমায় করতেই হবে, তখন বেশ, এখানেই বিয়ে করব। তোমরা সকলে খুশী হবে তো !

– আর তুই? তুই খুশী হবি না?

– আমার খুশী বা অখুশী হবার কথা কে কবে ভেবেছে, মা। অন্যের নেওয়া সিদ্ধান্তই তো এযাবৎ আমাকে চালনা করেছে।

এরপর রজতকে ফোন করে খুব সংক্ষেপে বলেছিল, "আমার বিয়ে হচ্ছে। খুব শীঘ্র। ভাবলাম, তোকে জানিয়ে দিই"। বলে ফোনটা নামিয়ে রেখেছিল সে।

সেই উইকেন্ডের শনিবার দিনই। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, সকালবেলা সদরে কলিং বেল বেজে ওঠার আওয়াজ শুনে, দরজা খুলে সঞ্জয় দেখেছিল, রজত দত্ত দাঁড়িয়ে।

মুখে চওড়া হাসি। এক হাতে ধরা মিষ্টির একটা বড় হাঁড়ি আর অপর হাতে একটা ছোট সুটকেশ।

– কি ব্যাপার? তুই হঠাৎ? না বলে কয়ে – "বিস্মিত সঞ্জয় বলেছিল।

– ঘাট হয়েছে রে, বাবা, ঘাট হয়েছে। তোর বিয়ের সংবাদটা দিয়েই ফোন কেটে দিয়েছিলি যে বড় ? তারপর একাধিকবার তোকে ফোন করেও পাই নি। তুই কল্ রিসিভই করলি না আদৌ! অগত্যা, না বলে কয়েই চলে আসতে হল আমাকে। আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে তোর প্রতি? না কি?

তখনো দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল সঞ্জয়। ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "কর্ত্তব্য! কিসের কর্ত্তব্য"?

– বল্‌ছি। আগে বাড়ির ভেতরে ঢুকি! না কি দরজা থেকেই বিদেয় করে দেবার মতলব তোর ?

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে, অপ্রস্তুত হয়ে সঞ্জয় বলেছিল, "সরি। আয়, চলে আয়"।

ভেতরে ঢুকে, মিষ্টির হাঁড়ি আর সুটকেশ নামিয়ে রেখে, আয়েস করে সোফার ওপর বশে রজত বলেছিল, "হ্যাঁ, তো কর্ত্তব্যের কথায় ফিরে আসি। আমি যে শর্মিঘটিত ব্যাপারে তোর একমাত্র পরামর্শদাতা ছিলাম, সে কথা মানিস কি না"?

সঞ্জয় নীরবে মাথা নেড়েছিল।

– তারপর, তোর পোস্ট-শর্মি দুঃসময়টাতেও আমিই তোর পাশে ছিলাম। আমার পরামর্শ কাজে লেগেছিল তোর। বল্ ঠিক কি না ?

সঞ্জয় চুপ করে শুনছিল।

– তুই যখন চুপ্‌চাপ আছিস, ধরে নিচ্ছি আমার বক্তব্য মেনে নিচ্ছিস, কি বল?

– "আহ্! অত ভণিতার কি দরকার"? সঞ্জয় এবার অধৈর্য হয়ে বলেছিল, "যা বলবার স্পষ্ট করে বল্। সময় নষ্ট করিস না"।

– অর্থাৎ আমাকে ঝেড়ে কাশতে বলছিস, তাই তো? তাহলে এবার বল্, আমার হবু বৌমা – অর্থাৎ তোর হবু বৌকে তোর কেমন লাগছে? তুই খুশীমনে বিয়ে করছিস তো? নাকি পরে আবার আমাকে ভোগাবি?

– মানে?

– মানে অতি সোজা, বন্ধু। তুই যদি বাড়ির চাপে পড়ে এই বিয়েতে রাজী হয়ে থাকিস, তাহলে তোর বিবাহোত্তর কালের জীবনের সমস্ত হ্যাপা তো আমাকেই সামলাতে হবে রে ভাই। আমি যখন তোর নিজস্ব ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, এ ব্যাপারে আমারও তো কিছু দায়িত্ব আছে, না কি?

– তাই বুঝি? তাহলে আমাকে কি করতে বলিস এখন?

– তোকে আপাততঃ কিছুই করতে বলি না। যা করার আমিই করব। তুই শুধু আমাকে তোর হবু শ্বশুরবাড়ির সন্ধানটা দে, দেখি। একবার গিয়ে দেখা করে আসি তাদের সঙ্গে।

গভীর বিস্ময়ে ওর দিকে খানিক চেয়েছিল সঞ্জয়। বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে রজত হেসে বলেছিল, "ঐ যে গাঙ্গুরামের রসগোল্লার হাঁড়িটা দেখছিস, ওটা কিন্তু মোটেই তোর জন্য আনি নি। ওটা এসেছে তোর হবু শাশুড়ি আর আমার হবু বৌমার জন্য"।

* * * * *

মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে পরদিন সত্যি সত্যি রওনা দিয়েছিল রজত, বন্ধুর হবু শ্বশুরবাড়ি অভিমুখে। গৌরী আর শ্রীতমার সঙ্গে আলাপ করতে। তারপর বাড়ি ফিরেছিল একটু রাত করে। মুখভার করে সঞ্জয় বলেছিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি ডিনার সাজিয়ে"।

রজত দেখেছিল, বেশ পরিপাটি করে খাবার টেবিল সাজিয়ে রেখেছে সঞ্জয়। তারপর অবিশ্বাসের হাসে হেসে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "তোর শাশুড়ি আর আমার ভাবী বৌমা, আমাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? ভাবতে পারলি কি করে তুই"?

– তুই ওদের বাড়ি ডিনার খেয়ে এসেছিস?

– অবশ্যই। মিষ্টির হাঁড়িটা যখন মিসেস ব্যানার্জীর হাতে দিয়ে বললাম, আমি ওঁর হবু জামাতার প্রধান পরামর্শদাতা, আর সেই সুবাদেই ওঁদের মাতা-পুত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি – বুঝলি," রজত চোখ নাচিয়ে বলল, "তখন আমার আদর-আপ্যায়ন আর দেখে কে! যেন আমিও ও বাড়ির আর এক জামাই হয়ে গেলাম। আর কি সাংঘাতিক ভাল সব রান্নাবান্না"।

পরদিন সকালে কোলকাতা ফিরে গিয়েছিল রজত। যাবার আগে বন্ধুকে বলেছিল, "শোন্ সঞ্জয়, বৌমাটি কিন্তু বেশ হয়েছে আমাদের। এই তোকে বলে রাখছি। শান্ত, ভদ্র, স্মার্ট এবং বুদ্ধিমতী। কোয়াইট আ পার্সোন্যালিটি। ভারি ব্যক্তিত্বময়ী। শুনলাম নাকি তোর চেয়ে সাত বছরের ছোট? সেটা একটা বাঁচোয়া," রজত হেসেছিল, "তার মানে তোকে সমীহ করে চলবে। আর সব চেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা, ওর মূল্যবোধ খুব প্রবল। আজকালকার আধুনিকাদের মত হাল্কা-ফুল্কা আর স্বার্থপর টাইপ নয়। ভালই থাকবি রে তোরা। ঝুলে পড় এর সঙ্গেই"।

– এত সব খবর তুই পেলি কি করে"? আশ্চর্য হয়েছিল সঞ্জয়।

রজতের মুখের ওপর চওড়া হাসির দীপ্তি খেলে গিয়েছিল। বলেছিল, "মানছি, আমার বৌমাটি সাইকোলজিস্ট। কিন্তু, আমিও যে ফিলসফার! সেটা ভুলে যাস না"।

(৫)

অবশেষে মাঘ মাসের এক শীতের সন্ধ্যায়, সেই গোধূলি মুহূর্ত এসে গেল। চয়ন, চন্দন আর শ্রীতমার বন্ধুরা মিলে, পান দিয়ে মুখ ঢাকা কনেটিকে পিঁড়িতে বসিয়ে সঞ্জয়ের চারিপাশে ঘোরাল। শুভদৃষ্টির মুহূর্তে দৃষ্টি বিনিময়ের সময়ে সঞ্জয়ের হাসি হাসি মুখ দেখে শ্রীতমার মনে হয়েছিল যেন এক রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে ওর সুমুখে। বরবেশে সঞ্জয় যেন নতুন রূপে প্রতিভাত হয়েছিল শ্রীতমার চোখে। আনন্দে, আবেশে উদ্‌বেলিত হয়েছিল ওর অন্তর! পরে, কিছু দিন পরে, শ্রীতমা সেই অজানা আবেগের নাম দিয়েছিল প্রথম প্রেম!

কনে সম্প্রদান করেছিলেন শ্রীতমার মামা। বিয়ের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান বিধিপূর্বক এবং নিখুঁতভাবে পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীতমার মামীমা প্রভা। অকল্যাণের আশংকায়, একমাত্র মেয়ের বিবাহের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নি ওর মা গৌরী। সবার অলক্ষ্যে, আড়ালে বসে প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে যেন তাঁর মেয়ে স্বামী সোহাগিনী হয়। রাজরানীর মত সমৃদ্ধ জীবন হয় তার। এবং পরিণত বয়সে, শেষ সময় যখন আগত হবে, তাঁর শ্রী যেন স্বামীর কোলে মাথা রেখে, শাখা-সিঁদূর নিয়ে যেতে পারে। মায়ের মত অকাল বৈধব্য যেন না নেমে আসে মেয়ের জীবনে।

উচ্চশিক্ষা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং স্বাধীন চেতনার জোরে জীবনের দুর্গম পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে এসেছেন গৌরী, কিন্তু জয় করতে পারেন নি মনের মধ্যে আবাল্য গেঁথে থাকা সংস্কারগুলোকে। পরিবর্তনশীল, আধুনিক সময়ের চিন্তা-ভাবনারা অতিক্রম করতে পারে নি তাঁর বাবা মায়ের দেওয়া প্রাচীন সংস্কার এবং মূল্যবোধগুলোকে।

চয়ন-চন্দনের সাথে পাল্লা দিয়ে, বিজয়া আর পবিত্রকে সামনে রেখে সারা রাত বিবাহ-বাসর মাতিয়ে রেখেছিল কনের বন্ধুরা। বরপক্ষ থেকে সঞ্জয়ের কয়েকজন সহকর্মীও সস্ত্রীক এসেছিলেন বাসরঘরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দে ভাগ বসাতে। আর কোলকাতা থেকে এসেছিল সঞ্জয়ের "একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা" রজত দত্ত।

স্ত্রী আচারের খুঁটিনাটি পর্বগুলো মিটে যাবার পর নাচ, গান আবৃত্তি, ছোট ছোট কমিক এবং সবশেষে অন্ত্যাক্শরি দিয়ে দারুন জমে উঠেছিল বাসর ঘরের আড্ডা।

খুব ভোরে, বাসর-জাগা ছেলেমেয়েদের জন্য, ভিয়েন বসিয়ে প্রভা প্রস্তুত করিয়েছিলেন গরম গরম জিলিপি, সিঙ্গাড়া এবং মসালা চায়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অতঃপর জয়-জয়কার পড়ে গিয়েছিল প্রভার উদ্দেশ্যে।

আমন্ত্রিতেরা সকলেই প্রভার অতিথি আপ্যায়নের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের মেয়ে ছিল না। শ্রীতমাকে আত্মজার মতই ভালবাসতেন তিনি। বিশেষ করে ওর বাবার অকালমৃত্যুর পর গৌরী আর শ্রীতমাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন প্রভা আর নিশিথ। বিয়েতে ব্যয়ের সিংহভাগের দায়িত্বও খুশী মনে তুলে নিয়েছিলেন তাঁরা।

বিয়ের সব অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর কনেকে নিয়ে বরকর্তা এবং বরযাত্রীরা কোলকাতা রওনা হয়েছিলেন। জীবনে এই প্রথম শ্রীতমার কোলকাতা যাত্রা!

– অ্যাই শ্রী, সাবধান। কোলকাতায় গিয়ে ভেব্‌লে যাস না যেন আবার। ওখানকার মেয়েগুলো যা চালু! "তোকে না ঘোল খাওয়ায়"! বিজয়া ফিস্‌ফিস্ করে ওর কানে বলেছিল।

সঞ্জয়কে শুনিয়ে পবিত্র বলেছিল, "দ্যাখ্ শ্রী, তুই যেন আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের চক্করে পড়ে যাস না! আমাদের ইউনি খোলার বেশ কিছুদিন আগেই এখানে ফিরে আসবি। এর যেন অন্যথা না হয়। বলে রাখলাম"।

আর চন্দন শ্রীতমার হাত ধরে বলেছিল, "কলকত্তার লোকেরা ভয়ংকর খতরনাক হোতে হ্যাঁয়। বচ্‌কে রহ্‌না, দিদিভাই"।

– "আরে, কেঁও ওকে ঘাব্‌ড়ে দিচ্ছিস," চয়ন ভাইকে ধম্‌কেছিল। তারপর শ্রীতমাকে বলেছিল, "ঘব্‌ড়াও না, দিদিভাই। আমরা আছি না? জরুরত হলে ছলাং মার কর পঁহুচ জাউঙ্গা তেরে পাস্"।

পবিত্র আর শ্রীতমার তুলনায় বিজয়ারা বেশ অবস্থাপন্ন। ওর বাবা কাশী শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থোপীডিক সার্জেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে তিনি খুব রমরমা প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্ গড়ে তুলেছেন। শিবালয়েতে তাঁর বিশাল দোতলা বাড়ি।

শ্রীতমা কোলকাতা যাত্রা করার পর, সেই বিকেলেই পবিত্র হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছিল বিজয়ার বাড়িতে। বিজয়াদের বাড়ি একটি অ্যাল্‌সেশিয়ন কুকুর আছে যার নাম রনি। এই রনির ভয়ে বিজয়াদের বাড়ি যায় না পবিত্র। তাই হঠাৎ ওকে দেখে খুব আশ্চর্য হল বিজয়া। ব্যস্ত হয়ে ওকে সোজা দোতলায় নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে বসাল সে। তারপর বলল, "হঠাৎ তুই যে এখানে"?

– "চলে এলাম", ঘরের ভেতরের আসবাবপত্রগুলো মন দিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে পবিত্র বলল, "তা তোর রনিকে তো দেখলাম না? মরে গেছে নাকি"?

– "ছিঃ"! বিরক্ত হয়ে বিজয়া বলল, "মরবে কেন? এখনো অনেক বছর বাঁচবে রনি। আপাততঃ ওকে নিয়ে হাঁটাতে গ্যাছে আমাদের মালী"।

– "বাঃ! কি মজা! আমি যদি তোদের বাড়ির কুকুর হয়ে জন্মাতাম, কি ভাল জীবন হ'ত আমার একবার ভেবে দ্যাখ! ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া, মালীর সঙ্গে মর্নিং আর ইভনীং ওয়াকে যাওয়া! পড়ালেখার কোন ঝঞ্ঝাট থাকত না। কাব্যদেবী আমার মাথায় উদ্‌ভট সব চিন্তা-ভাবনা দিয়ে তাড়িয়ে বেড়াত না। আর সব চেয়ে বড় প্রিভিলেজটা কি হ'ত বল্ দেখি –"

বিজয়া হাঁ করে ওর কথা শুনছিল। সেই দিকে আড়চোখে চেয়ে নিয়ে পবিত্র আবার বলল, "শুনবি, কি প্রিভিলেজ জুটত' আমার ভাগ্যে"?

– বল্। সব সময়ে তোর প্রলাপ শুনে শুনে তো এমনিতেই আমার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তা এটাও শুনি। কি প্রিভিলেজ?

– ক্ষেপে যাবি না তো আবার?

– আহ্।

– আচ্ছা, আচ্ছা, শোন্ তবে। প্রিভিলেজটা কিন্তু অতুলনীয় হ'ত রে, জয়া। আমি দিব্যি আয়েস করে তোর বিছানার এক কোনে শুতে পারতাম। তুই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতিস, আর আমি দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে পড়তাম।

বিজয়ার রাগ হল না একটুও। পবিত্রর কথাবার্ত্তা এবং আচরণে সে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে ওর কিছুই আর তাকে নতুন করে বিরক্ত বা বিচলিত করে না। সে পবিত্রর দিকে চেয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বলল, "তুই হঠাৎ আমাদের বাড়ি চলে এলি যে? কি ব্যাপার? শ্রীকে খুব মিস্ করছিস বুঝি"?

– তা অবশ্য করছি একটু একটু। কিন্তু তোর কাছে আসার কারণটা অন্য।

– কি কারণ?

– আমার মনটা বড় খচ্‌খচ্ করছে, জানিস! কেবলি মনে হচ্ছে আমাদের শ্রীকে আমরা হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলাম না তো!

– হঠাৎ এরকমটা মনে হবার কারণ?

– তোর কি মনে হ'ল না যে ওই সাহেবী চেহারার ছেলেটা খুব ধনী পরিবারের মানুষ?

– হতেই পারে। তাতে তোর মন খচ্‌খচ্ করছে কেন?

– "খচ্‌খচ্ করা অনুচিত, তাই না"? পবিত্র একটু আনমনা হয়ে বলল, "কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে শ্রীর ম্যারেড লাইফটা, অন্ততঃ প্রথম কয়েকটা বছর তো বটেই, সুখের হবে না"।

চম্‌কে উঠল বিজয়া। তারপর উষ্ণকণ্ঠে বলল, "দ্যাখ্ পবিত্র, তুই কাব্যি করছিস, করে যা। গীটার বাজিয়ে পপ্ ম্যুজিক চর্চা করছিস, সেটাও ঠিক আছে। অর্থনীতিবিদ্ হবি বলে ইকনমিক্‌স্ নিয়ে পড়াশোনা করছিস, অতি উত্তম কথা। কিন্তু, প্লীজ প্লীজ, তোকে হাতজোড় করে মিনতি করছি, সাইকিক চর্চাটা ছেড়ে দে। এই দূরদৃষ্টির ভাঁওতা দিয়ে তুই আর নিজের আর তোর কাছের মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলিস না"।

– জীবন দুর্বিষহ করছি আমি! আমার নিজের আর তোদের? নাঃ। সেটা কোনমতেই উচিত না। আচ্ছা, আর এসব কথা আমি বলব না।

– গুড্। থ্যাংক্যু। চল্ নীচে গিয়ে দেখি একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে পারি কি না আমাদের জন্য। আর সঙ্গে গরমাগরম আলুর চপ্", বিজয়া এবার নরম সুরে বলেছিল।

(৬)

কোলকাতা শহরের সঙ্গে শ্রীতমার প্রথম পরিচয়। যৌথ পরিবারের সঙ্গে বিশেষ করে সঞ্জয়দের বিশাল যৌথ পরিবারের সঙ্গে – মোলাকাৎ এবং বসবাসও এই প্রথম। অপরিচিত, নতুন সেই পরিবেশ – ওকে দিশাহারা করে তুলল। প্রথম দিনে ওর চারিপাশে বেশ কয়েকজন সমবয়সী ননদ, দেওর এবং জায়েদের আনাগোনা এবং কথাবার্ত্তার ধরণে হক্‌চকিয়ে গেল সে। যেন সে ভিন্ন এক জগতের বাসিন্দাদের মাঝে এসে পড়েছে। বিজয়ার সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল। সত্যিই কি শ্বশুরবাড়িতে পা রেখেই ভেব্‌লে গেল শ্রীতমা! চাপা কান্না গুম্‌রে উঠতে লাগল ওর বুকের মধ্যে।

– কি গো নতুন বৌ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি মাঝ নদীতে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ! সাঁতার কাটতে জানো তো?

শ্রীতমা দেখল কখন যে একটি মেয়ে, বয়সে সম্ভবতঃ ওর চেয়ে খানিক বড়, ওর পাশে এসে বসেছে টেরই পায় নি ও।

সে নীরবে চেয়ে রইল ওর দিকে। "এত কি ভাবছ, একা একা বসে," শ্রীতমার ডান হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেয়েটি বলল, "আমি দেবিকা। দেবিকা রায়। তোমার বরের এক কালের সহপাঠী। আমরা এক সঙ্গে কলেজের ফাইনাল দুটো বছর পড়েছিলাম। তারপর তো তিনি বিদেশে চলে গেলেন আর আমি প্রেসিডেন্‌সি কলেজে"।

শ্রীতমা ওর দিকে চেয়ে বলল, "আপনি প্রেসিডেন্‌সি কলেজের ছাত্রী? কি সাবজেক্ট আপনার"?

– ফিজিক্‌স্। আমি এখন প্রেসিডেন্‌সিতে ফিজিক্‌স্ পড়াই।

মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইল শ্রীতমা। এমন গুণী, এমন মেধাবী, এমন বিদূষী মহিলা এই দেবিকা! অথচ কেমন নম্র, বিনয়ী আর আলাপী। আর দেখতেও এক্কেবারে সুচিত্রা সেন! সুচিত্রা সেনের মতই ভাসা ভাসা মায়াবী দুটি চোখ। ঢল্‌ঢলে, ডিম্বাকৃতি মুখ। লম্বা, ছিপ্‌ছিপে গড়ন। গায়ের রংটা অবশ্য চাপা। কিন্তু কিছু এসে যায় না তাতে। দেবিকা রায়ের মুখের দিকে একবার চোখ পড়লে, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন।

– সঞ্জয়ের মুখে শুনলাম তুমি বি এইচ ইউ-র ছাত্রী। এবছর সাইকোলজির অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট করেছ।

– হ্যাঁ," শ্রীতমা ঘাড় নাড়ল।

– এবার তুমি কি করবে ভাবছ? এখানেই ইউনিতে মাস্টার্স পড়বে, না, গৃহবধূ হবে?

– না", কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল শ্রীতমা, "আমি বি এইচ ইউ-তে অ্যাড্‌মিশন নিয়েছি। সেখানেই এম এ পড়ব। সাইকোলজিতে। তারপর পি এইচ ডি করব ভাবছি।

– বাঃ! খুব ভাল। শুনে আমি খুব খুশী হলাম। পড়াশোনাটা চালিয়ে যেও যদ্দূর পারো। শিক্ষাই হ'ল মেয়েদের হাতিয়ার। শিক্ষার সাহায্যে আজকের যুগে, মেয়েরা নিজের জন্য স্বতন্ত্র একটা জায়গা করে নিতে পারে। আর করে নিচ্ছেও।

– একদম ঠিক কথা। আমিও সেরকমটাই মনে করি।

– আর বিয়ে? আমি মনে করি, এ যুগের ভারতবর্ষে, মেয়েদের কাছে বিয়ের প্রসঙ্গটাই অবান্তর হয়ে উঠবে ক্রমশঃ। তুমি দেখে নিও।

বিস্মিত হয়ে শ্রীতমা চেয়ে রইল।

– "কি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা"? দেবিকা বলল, "কিন্তু দেখে নিও, একদিন সেরকমটাই হবে। হয়ত' আরও কিছু বছর লাগবে, অবশ্য"।

শ্রীতমা নীরব।

– "কেন জানো, শ্রী"? দেবিকার চোখেমুখে শান্ত, কঠিন একটা ছায়া নেমে এসে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বলল, "কারণ আমাদের পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজে আ গর্ল ইজ টেক্‌ন্ ফর গ্রান্টেড যতই শিক্ষিত হোক না সে, যতই বড় চাকুরী করুক না কেন! নিজের পরিবারের জন্য যতই না নিঃস্বার্থ ত্যাগ করে চলুক না কেন সে আজীবন – তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, পরিবারের কাছে, এমন কি তার স্বামীর কাছে – সে শুধুই একটি নারী! শুধু একটি পরাধীন সত্তা সবার চোখে"।

– আপনি কি বিবাহিত?

– "পাগল"! দেবিকা হেসে উঠল, "বিয়ের কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না"।

– "অথচ আপনি এত সুন্দরী"! ধীরে ধীরে বলল শ্রীতমা।

– "সুন্দর হলেই বুঝি সেই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে"! পরিহাসে তরল হল দেবিকা, "এই বুঝি বুদ্ধি তোমার! পাগল মেয়ে একটা। নারীর সৌন্দর্য তো তাকে খেলার পুতুল করে রাখে পুরুষের কাছে। শোন নি কথাটা, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"? ওই পুত্র-উৎপাদনের প্রয়োজনে নারীর সৌন্দর্য পুরুষের কাছে অতি বাঞ্ছনীয়। মোদ্দা কথা, এখনো আমাদের শিক্ষিত সমাজে নারী প্রধানতঃ সার্ভ করেন পুরুষের বায়োলজিকাল নীড। পুরুষের বংশবৃদ্ধির নিমিত্তমাত্র"।

দেবিকার ব্যাখ্যা শুনে শ্রীতমার মুখ-চোখ রক্তিম হল। সঞ্জয়ের হাতেও কি তাহলে শ্রীতমা হয়ে থাকবে শুধুই একটা মনোরঞ্জন সামগ্রী! শয্যা সঙ্গিনী ছাড়া আর কিছুই না! মাত্র তিনবার অতি অল্প সময়ের পরিচয়ে, কি একজন পুরুষকে সত্যিই যাচাই করে নেওয়া যায়? বোঝা যায় তার আসল চেহারাটা? দুটি অপরিচিত পরিবারের মধ্যস্থতায় নির্বাচিত, সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যাপারটা আসলে লটারি পাবার মতই। ভাগ্য নির্ধারিত। অথচ, শ্রীতমা এত বছর বিশ্বাস করত, সে নিজের কর্ম দিয়ে ভাগ্য গড়ে নেবে! এবার প্রসঙ্গ পাল্‌টে সে বলল, "আপনাকে কি বলে ডাকব বলুন তো? খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করে"।

– তুমি আমাকে দেবিকাদি বলেই ডেকো, কেমন? আর তোমাকেও আমার ভারি পছন্দ হল। পারলে যোগাযোগ রেখো।

ঘাড় নেড়ে সায় দিল শ্রীতমা।

* * * * *

ফুলশয্যার রাত। কম্পিত বক্ষে ফুলে ঢাকা পালঙ্কে কনের প্রতীক্ষা। সংশয় ভরা চিত্তে, ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে নতুন বরের নব-পরিণীতার কাছে এগিয়ে যাওয়া। গতানুগতিক ভাবেই ঘটে গেল ফুলশয্যার রাতে, বরের করণীয়র প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে, সঞ্জয় নববধূর মুখোমুখি বসে, সঞ্জয় ধীরেসুস্থে পকেট থেকে একটা পার্কার গোল্ড ক্যাপ ফাউন্টেন পেন এবং একটি ওমেগা গোল্ড হাত ঘড়ি বার করল। শ্রীতমার ডান হাতটি তুলে নিয়ে সন্তর্পনে উপহারদুটো সেই হাতে রেখে বলল, "এই কলম তোমার হাতে শাণিত অস্ত্র হয়ে উঠুক একদিন। এই কলম যেন তোমাকে বুদ্ধিজীবিদের ফ্রন্ট রো'তে আসন করে দেয়। আর ঘড়িটা সারাক্ষণ টিক্‌টিক্ করে তোমাকে মনে করাবে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ্য।

– আপনিও যে এমন দার্শনিকের মত কথা বলতে পারেন, জানতাম না তো!" শ্রীতমা বলল, "বায়োমেডিকাল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মুখে এমন বুলি! খুব ইম্‌প্রেসিভ"!

– আমি জানি, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেকটা বড়, কিন্তু তাই বলে সেই সত্যটা আমাকে সব সময়ে "আপনি-আজ্ঞে" করে মনে করিয়ে দিও না, প্লীজ। আমাকে তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মনে করে, "তুমি"ই বলো"।

অপ্রস্তুত হয়ে শ্রীতমা ঘাড় নাড়ল।

– এই যে আমরা এত রকম শপথ নিলাম স্বয়ং অগ্নিদেবকে সাক্ষী রেখে কত মন্ত্র বললাম, পুরুত ঠাকুরের প্রম্পটিংয়ে। সে সবের মানে বুঝলে তুমি?

– কিছু কিছু।

– আমি তেমন কিছুই বুঝলাম না। আসলে কোনদিন হিন্দু বিয়ের রিচুয়ালগুলোর অর্থ তলিয়ে দেখার কথাই ভাবি নি। আজ জানতে ইচ্ছে করছে, হোয়াট আ হিন্দু ওয়েডিং ইজ অল্ অ্যাবাউট!

– খানিক ধারণা আমার আছে"। শ্রীতমা বলল, "বিবাহ কথাটার মানে উৎসর্গমূলক। অর্থাৎ – এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি একটি মেয়ে এবং পুরুষকে – দেহে, মনে, প্রাণে পরস্পরের কাছে উৎসর্গ করে দেয়। অগ্নি সাক্ষী রেখে, তারা দুজন সারা জীবন ধরে অতঃপর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের পথ অনুসরণ করে"।

– ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ!

– ইয়েস। ধর্ম, মানে কর্তব্য। অর্থ, অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন। কাম, মানে দৈহিক বাসনা চরিতার্থ এবং মোক্ষ – জীবন চক্র থেকে মুক্তি।

– বাঃ! তুমি তো দেখছি বেশ ভালই খবর রাখো হিন্দু বিবাহের। আই অ্যাম ইম্‌প্রেস্‌ড্। এবার আমাকে সত্যি-সত্যি একটা কথা বলো তো –

– কি?

– আমাকে বিয়ে করে তুমি খুশী হয়েছ তো?

– "না হয়ে আর উপায় কি"? শ্রীতমা বলল, "ছোটবেলা থেকে জেনেছি নিজের দেহ, মনকে পবিত্র রাখতে হবে স্বামীর প্রতীক্ষায়। তা আমার স্বামীই যখন আমার জীবনের প্রথম পুরুষ, তাকে পেয়ে তো খুশী হবারই কথা। আমিও খুশী হয়েছি। খুব খুশী"।

সঞ্জয় খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "আমি তোমার জীবনের প্রথম পুরুষ! ডোন্ট টেল মী, তুমি তোমার কলেজে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো নি! কেন, পবিত্রকে তোমার সঙ্গেই তো মীট করেছিলাম।

– "অবশ্যই। আমার কলেজে সহপাঠী ছেলেদের অনেকের সঙ্গেই আমার ভাব আছে। কিন্তু তারা তো আমার বন্ধু। শুধুই বন্ধু"।

– বন্ধু! শুধুই বন্ধু!", সকৌতূকে বলল সঞ্জয়, "কিন্তু তাদের কারো সঙ্গেই বন্ধুত্বটা প্রেমের আওতায় গড়িয়ে যায় নি, বলছ"?

– হ্যাঁ, বলছি", দৃঢ়স্বরে বলল শ্রীতমা, "কারণ বন্ধুত্ব আর প্রেমের মাঝের স্লেন্ডর মার্জিনটার সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে"।

– তাই? প্লীজ এক্স্প্লেন।

– বন্ধুত্বের সীমানার মধ্যে দুজন মানুষ পরস্পরের সান্নিধ্যে শত-প্রতিশত খুশী থাকে, সন্তুষ্ট থাকে। অবলীলা ক্রমে তারা চিন্তা-ভাবনা শেয়ার করে। আর সব চেয়ে বড় কথা, বন্ধু যখন কারো প্রেমে পড়ে, সেটা ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দেয় না অপর বন্ধুর বুকের মধ্যে। বরং সে তখন তার নতুন প্রেমে-পড়া বন্ধুটির গার্লফ্রেন্ড অথবা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক হয়।

– আর প্রেম? প্রেমে পড়লে কি হয় শুনি?

– প্রেম সহজেই প্রেমিককে এক সাংঘাতিক মানসিক অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে। প্রত্যাখ্যাত হলে প্রেমিক পাগল হয়ে যেত পারে। অথবা সুইসাইড্।

– কে বলল তোমাকে এসব কথা? নাটক নভেল পড়ে জ্ঞানলাভ করেছ বুঝি?

– নাটক-নভেল! সে তো আছেই", শ্রীতমা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "আমি নিজেও দু-তিনজনকে দেখেছি যারা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের শেষ করে দিয়েছে।

চম্‌কে উঠে সঞ্জয় মনে মনে বলল, "দিস্ ইজ্ গেটিং টূ ক্লোজ টু হোম। প্রেম-প্রসঙ্গ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করাই মঙ্গল। প্রসঙ্গটা এবার পাল্টানো যাক্"।

সে শ্রীতমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল ওর পাশে। তারপর গাঢ়স্বরে বলল, "এসো এই শুভক্ষণে আমরা দুজনে মিলে একটা শপথ গ্রহণ করি –"

পুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে, এতখানি ঘনিষ্ঠ ভাবে কোন শয্যায় বসার অভিজ্ঞতা শ্রীতমার নতুন। তার মন উদ্দাম আবেগ এবং অজানা শিহরণের আনন্দে আপ্লুত। অথচ মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শরীর হল সংকুচিত। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "কি শপথ"?

– শপথ এই যে – "আমরা আজীবন একান্তভাবে পরস্পরের অনুগত ও নির্ভর থাকব। আমাদের দুজনের মাঝখানে কোনদিন বাইরের তৃতীয় কেউ ঢুকতে পারবে না। একে অন্যকে সম্মান দেব আমরা, ভালবাসব সারা জীবন। আর –"

শ্রীতমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

– "আর", সঞ্জয় বলে চলল, "যদি কোনদিন কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই আমরা – দুজনে এক সঙ্গে যুঝব, সব বাধা অতিক্রম করে। কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি উপেক্ষা করে পরস্পরকে ক্ষমা করব। ছেড়ে চলে যাব না"।

- বাব্বাঃ! একসঙ্গে এতগুলো শপথ নিতে হবে"? শ্রীতমা হাসল।

– আমি তো অলরেডি নিয়ে নিয়েছি, শ্রী। এবার তোমার পালা। তুমিও শপথ নাও।

– ঠিক আছে। শপথ নিলাম।

সঞ্জয় তার নবপরিণীতার কুসুম অধরে এঁকে দিল তার প্রথম অনুরাগসিক্ত চুম্বন।

* * * * *

কাশী ফিরে যাবার আগে, কোলকাতাবাস ওদের আর মাত্র সাতদিন। এরই মধ্যে শ্রীতমাকে কোলকাতার নানা আকর্ষণ দেখাতে আগ্রহী সঞ্জয়। চর্কীর মত ঘুরতে লাগল ওরা দুজনে অতঃপর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়ম, বিরলা প্ল্যানেটোরিয়ম, নিকো পার্ক, হাওড়া ব্রিজ, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের শ্বেতপাথরের প্রাসাদ – সমস্তই দেখা হয়ে গেল তিন-চার দিনের মধ্যেই। হাতে আর মাত্র দিন তিনেক বাকী।

– এই দুটো দিন আর কি দেখতে চাও"?, এক রাতে, বিছানায় শুয়ে নববধূকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল সঞ্জয়।

– "দু'দিনের হনিমূনে যেতে চাই", শ্রীতমা বলল।

– হনিমূন!

– হনিমূন! সে তো আর কিছুদিন পরে ছুটি নিয়ে যাব আমরা।

– আমি এখন একটা শর্ট হনিমূনে যেতে চাই। নইলে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলব কি!

– ও, এই কথা," সঞ্জয় হাসল, "ঠিক আছে, কোথায় যেতে চাও বলো"?

– শান্তি নিকেতন।

– শান্তি নিকেতন! অফ্ অল্ দ্য প্লেসেস!

– বা রে! কোলকাতা এলাম আর শান্তি নিকেতন না দেখে ফিরে যাব"? শ্রীতমা পাশ ফিরে স্বামীর বুকের ওপর নিজের মুখখানি ন্যস্ত করে বলল, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধনাস্থল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অবদানে সমৃদ্ধ শান্তি নিকেতন। না দেখে চলে যাব"?

একটু থেমে, কি একটা চিন্তা করে সে আবার বলল, "তাছাড়া – সেখান থেকে কাঁথা সিল্কের শাড়ি কিনে নিয়ে যাব মা, মামীমা আর জয়ার জন্য। নিয়ে যেতেই হবে"। বলে গম্ভীরমুখে ঘাড় নাড়ল সে।

– "তাই চলো তবে। বেড়িয়ে আসি তবে দু দিনের জন্য", সঞ্জয় বলল। মেয়েদের শাড়ির ওপর আকর্ষণ বোধ হয় স্বামীর চেয়েও বেশী! মনে মনে ভেবে হেসে ফেলল সে।

পরদিনই ড্রাইভার-সহ একটা গাড়ি ভাড়া করে ওরা শান্তি নিকেতন যাত্রা করল। সঞ্জয়ের সেজদা নিজে দায়িত্ব নিয়ে ফোন করে, বোলপুরের সরকারী ট্যুরিস্ট লজে ওদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কয়েক ঘন্টা পরে ট্যুরিস্ট লজে গিয়ে পৌঁছল ওরা। নিজেদের কটেজে চেক-ইন্ করল ওরা। তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, ফ্রেশ হয়ে নিয়ে পর্যটনে বেরিয়ে পড়ল ওরা। শান্তি নিকেতনের গ্রাউন্ড্সে পৌঁছে, গাইডের সঙ্গে ওরা ঘুরে ঘুরে দেখল দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত নানা বিভাগ। শুনল প্রত্যেকটি স্থাপত্যের ইতিবৃত্ত। কল্পনাবিলাসী এবং সাহিত্যমনা শ্রীতমা একটা স্বপ্নাবিষ্ট

ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গেল। শ্রীতমার মুখের অভিভূত চেহারা দেখে মনে মনে তৃপ্ত হল সঞ্জয়। ওদের শান্তি নিকেতনে হনিমূন করতে আসাটা সার্থক হল!

উত্তরায়ণ কম্প্লেক্সে ঢুকে ঘুরে ঘুরে দেখছে ওরা। এই উত্তরায়ণে নির্মিত পাঁচটি বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ তিরিশটি বছর কেটেছিল। কোনার্ক, উদয়ন, শ্যামলী, পুনশ্চ ও উদীচি। প্রত্যেকটি স্থাপত্যের পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে কবির জীবিতকালে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা। উদয়নের কাছে এসে পড়েছে ওরা। সহসা সঞ্জয় আর শ্রীতমাকে ভীষণভাবে চম্‌কে দিয়ে, সঞ্জয়ের মুখোমুখি আবির্ভূত হল এক নারী। আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ-মেশানো কণ্ঠস্বরে সে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! সঞ্জয় তুমি এখানে! হোয়াট আ স্মল্ ওয়ার্লড"!

সঞ্জয় হতবাক্ হয়ে দেখল, সুমুখে দাঁড়িয়ে শর্মিলা। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। শ্রীতমা তখন নিরীক্ষণ করছে অপরিচিতাকে। ছিম্‌ছাম্ কিন্তু অত্যাধুনিকার সাজ। দীর্ঘাঙ্গী। ছিপ্‌ছিপে গঠন। নিখুঁত মুখখানি যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া ভাস্কর্য প্রাণ পেয়ে সজীব হয়ে উঠে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। মেয়েটির গায়ের রং শ্যামলা। কিন্তু, শ্রীতমার মনে হল, এই মেয়েকে শ্যামবর্ণই মানিয়েছে অনেক বেশী।

শর্মিলা আর একটু এগিয়ে এসে দু'হাত বাড়িয়ে সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে, সশব্দে ওর গালে একটা চুমু খেল। তারপর বলল, "ওয়াও, সঞ্জয়, তোমাকে দারুন হ্যান্ডসম লাগছে। অ্যান্ড উই সীম টু হ্যাভ গ্রোন অপ্"!

নিজেকে শর্মিলার আলিঙ্গন মুক্ত করে সরে দাঁড়াল সঞ্জয়। রক্তবর্ণ ধারণ করেছে তার মুখ। কি বলবে তার মাথায় আসছে না সেই মুহূর্তে। কিন্তু শর্মিলার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। আচম্‌কা ওর চোখ পড়ল শ্রীতমার দিকে। সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটি কে? তুমি বিয়ে করেছ বুঝি"?

– "হ্যাঁ", সঞ্জয় বলল, "আমার স্ত্রী শ্রীতমা। আর শ্রীতমা, ইনি –"

সঞ্জয়ের কথাগুলো লুফে নিয়ে শর্মিলা, শ্রীতমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "আমি তোমার বরের অতি-পরিচিতা বান্ধবী, বুঝেছ? আমার নাম শর্মিলা। তোমার বরকে মেলবোর্ন থেকে চিনি আমি"। একটু থেমে মুচ্‌কি হেসে বলল, "বল্‌তে পারো, সঞ্জয়কে অনেকটাই মানুষ করেছি আমি। ঠিক কি না, বলো সঞ্জয়?" সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে শর্মিলা। শ্রীতমা হাঁ করে চেয়ে আছে ওদের দিকে।

– "আমাদের এবার এগোতে হবে", সঞ্জয় শ্রীতমাকে বলল, "চলো শ্রী, এখনো অনেক কিছু দেখা বাকী আছে আমাদের"।

– দাঁড়াও, দাঁড়াও," আদুরে গলায় বলে উঠল শর্মিলা। এত বছর পর দেখা হল তোমার সঙ্গে, আর আমরা একটু ক্যাচ্-অপ্ করব না? তোমার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করব না? চলো, কাছে পিঠে একটা কফিশপে গিয়ে একটু বসি"। শ্রীতমার দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল সে।

– তাই চলো", শ্রীতমা বলল।

– "না," দৃঢ়কণ্ঠে বলল সঞ্জয়, "আমাদের হাতে এখন সময়ের অভাব। চলো শ্রী," শ্রীতমার হাতে হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়ে এবং শর্মিলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অগ্রসর হল সে।

– "আচ্ছা, এমনটা কেন করলে তুমি"? সঞ্জয়ের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল শ্রীতমা।

– শর্মিলা বসুর সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার মত অত ধৈর্য বা ইচ্ছে – কোনটাই আমার নেই। "উই হ্যাভ বেটার থিংস্ টু ডু"।

– "কি যে বলো! অথচ তোমরা নাকি বহু বছরের বন্ধু! তোমাকে নাকি অনেকটা মানুষ পর্যন্ত করেছে"?

– যত্তো সব ফাল্‌তু কথা। দেখলে না কি রকম বক্‌বক্ করছিল! ফ্রিভলস, রেক্‌লেস্ উওমন"।

– বাব্বাঃ! এত রেগে আছ কেন ওর ওপর? আমার তো ওকে বেশ ভাল লাগল, যতটুকু দেখলাম।

– আমরা এখন কলা ভবনের দিকে চলেছি, শ্রী। শর্মিলা বসুকে নিয়ে কথাবার্ত্তা এখন বন্ধ রেখে কলা ভবনের ইতিহাসের ওপর কন্‌সেন্‌ট্রেট করলে ভাল হয় না? কি বল"? সঞ্জয়ের কথায় বিরক্তির আভাস পেল শ্রীতমা।

কি করে ওকে বোঝাবে সঞ্জয় যে সবার বন্ধুত্বের পরিভাষা শ্রীতমার পরিভাষার সাথে মিলমিশ খায় না!

(চলবে)

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

ধারাবাহিক

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

চল নিধুবনে

পর্ব ৪

আরশিনগরে একদম সকালে ওঠেন দুজন। একজন হেনা কুমার। অন্যজন চিত্রা সরকার। যদিও আরশিনগরের সকলেই এদের দিদি বলে ডাকে। পদবির ব্যবহার হয়না। প্রতিদিন চারটেয় দু'জনের ঘুম ভাঙে আর চা খেয়ে জপ সেরে দু'জনেই পথে নামেন। হাঁটতে হাঁটতে আরশিনগরের একেবারে মুখটায় এসে কালো ঢিবির ওপরে বসেন দুজনে। এদিকে ঘরবাড়ি তেমন নেই। দু'পা এগোলেই জঙ্গল। জঙ্গলের এপাশে কালো ঢিবি। সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে আরশিনগর। ওই কালো ঢিবির গায়েই আঁকা একটি বাঁশি। বাঁশি ধরে থাকে বালা পরা দুটি হাত। আর সবের পেছনে, মাথার উচ্চতায়, জীবন্ত এক ময়ূরপুচ্ছ।

ওরাও বসলেন, আর জঙ্গলের ভেতর থেকে হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে দুটো কুকুর ছুটে এলো। ওদের ডাক শুনে আরো দু'একটা কুকুর ছুটে যাচ্ছে ভেতরে। হেনার ভারি চেহারা। এতটা রাস্তা হেঁটে এসে হাঁফাচ্ছেন অল্প অল্প। চিত্রা ছিপছিপে লম্বা। অসম্ভব কর্মঠ মহিলা। যোগব্যায়ামের কারণেই মনে হয় কখনও ক্লান্ত হন না। দুজনে চুপ করে মিনিট দশেক বসবেন ভেবেছিলেন। হল না। কুকুরের ডাক, ওদের পেছন পেছন আরো কুকুরদের ভেতরে ঢুকে যাওয়া একটা কৌতুহল তৈরি করছে। চিত্রা উঠে পড়লেন, "তুমি বসো। আমি দেখে আসছি। হঠাৎ কুকুরগুলো এত চেঁচাচ্ছে কেন?"

"চল আমিও যাই। তুমি একা যাবে কেন?"

চিত্রা হাসেন। ওনার হাত ধরে হেনাও দাঁড়িয়ে পড়েন। কুকুরদের ডাক ক্রমশঃ বাড়ছে। আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকেন তারা। অদ্ভুত ব্যাপার, দূরের একটা ঝোপের কাছে কুকুরগুলো জড়ো হয়েছে। আর ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকছে ওরা । ওদের এগোতে দেখেও কুকুরগুলো একটুও এগিয়ে এল না। হেনা আর চিত্রা একটু ঘাবড়ে গিয়েই ঝোপের দিকে এগোতে থাকেন।

ঝোপের মধ্যে পাশ ফিরে গুটিয়ে শুয়ে আছে একটি ছেলে। এপাশ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বয়স বেশি হবেনা। কোন সাড় নেই। প্যান্টের পায়ের কাছে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মনে হয় বেঁচে নেই। ছেলেটাকে দেখার পর দুজনেই আঁতকে ওঠেন।

চিত্রা এগোচ্ছিলেন ছেলেটার নাড়ি দেখার জন্য।

হেনা ওর হাত ধরে থামিয়ে দেন। "না ধরতে হবে না। ভূষণকে চলো ডেকে নিয়ে আসি। ও এসে দেখুক। তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

আরশিনগরে ঢোকার মুখেই প্রায় ঝুমুরদের বাড়ি। এত ভোরে ওদের ডাকতে একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু উপায় নেই। ডাকতেই হল। ভূষণ একাই দরজা ভেজিয়ে চলে আসছিল। ঘরে দরজা দিয়ে শুয়েছে ঝুমুর আর মনুয়া। ওদের দরজার সামনের বারান্দায় শোয় ভূষণ। কিন্তু হেনাদি বললেন ঝুমুর আর মনুয়াকেও সঙ্গে নিতে। প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

ভোরবেলা চারজনে প্রায় দৌড়ে পৌঁছল ওই জঙ্গলে। মনুয়াকে ডাক্তারবাবুকে ডাকার জন্য পাঠানো হয়েছে। ঝোপের কাছে একভাবে শুয়ে আছে মানুষটা। কোন নড়াচড়া নেই।

ভূষণ গিয়ে উল্টে দিতেই অবাক হয়ে গেল ওরা। সুন্দর মুখশ্রী। ফর্সা গালে অবিন্যস্ত দাড়ি। তাড়াতাড়ি হাতের কবজি ধরে নাড়ি দেখতে শুরু করলেন চিত্রা।

"একে নিয়ে যেতে হবে। নাড়ি চলছে। মানে বেঁচে আছে।"

চিত্রার ঘোষণার পরে পরেই ছেলেটাকে সবাই মিলে বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। হেনা বাদে তিনজনেই ধরেছে ওকে। ভূষণ কোলে করে একাই নিয়ে যাবে বলেছিল। ছেলেটির বয়স আর স্বাস্থ্য দেখে হেনাই বারণ করলেন। বেশি মোটা না হলেও ছেলেটির চমৎকার চেহারা। একা ভূষণের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াটা একটু বেশিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু এসে ভালকরে নাড়ি দেখলেন। "মনে হচ্ছে ভয়ের কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে আছে। হয়ত অদম্য ইচ্ছেশক্তির জোরেই বেঁচে আছে ছেলেটা। ভূষণের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন একটা কাজ কর। প্যান্টটা খুলে দাও। পায়ের ক্ষতচিহ্নটা একবার দেখা দরকার।"

ঝুমুর আর মনুয়া দুজনেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হেনা বললেন, "চলে যাচ্ছ কেন? রুগীকে লজ্জা পেতে নেই।"

"পায়ে গুলি লেগেছিল। সেই অবস্থায় নদীতে পড়ে যায় বা নদী ডিঙোতে যায়। ভিজে জামাকাপড় দেখে তাই মনে হচ্ছে। সম্ভবতঃ তারপর, যাহোক করে এ ঝোপের আড়ালে লুকোয়।" ডাক্তারবাবু সবটা বলার পর ঘাড় মুছলেন একবার।

"শুনুন হেনাদি, একটু গরম জল লাগবে। ওর পায়ের বুলেটটা বার করতে হবে। আর একটা কথা এ যে এখানে আছে, সে কথাটা বেশি লোকের জানার দরকার নেই। সেটা আপনাদের মধ্যেই রাখুন। অনেকদিন চিকিৎসা করছি। রুগী দেখেই অনেককিছু বলে দিতে পারি। এই কেসটা একেবারেই নর্মাল নয়। এর খোঁজ হবে। খবরটা বেরিয়ে গেলে বিপদ হতে পারে। ও তো আর নিজের পায়ে নিজে গুলি করেনি।" কেউ কোনও মন্তব্য করে না।

নিজের ডাক্তারির ব্যাগ খুলছিলেন উনি। ঝুমুর গরমজল রেডি করছে।

এখনও চোখ খোলেনি ছেলেটা। বুলেট বেরিয়েছে, টিটেনাস ইঞ্জেকসানও পড়েছে। চিত্রা বলছিলেন হেনাদিকে, "রাখে হরি মারে কে?"

প্রায় ঘন্টাখানেক কাটিয়ে, যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান ডাক্তারবাবু। এর মধ্যে বারবার চায়ের কথা বললেও খেতে রাজি হননি। যেতে যেতেই উনি আবার বলেন,"ভূষণ, চল আমার সঙ্গে। ওষুধ দেব দশদিনের। খাওয়াতে হবে। আর বারবার গরম দুধ খায় যেন। ভিজে জামা কাপড়গুলোও ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার। ভূষণ চল। আর দেরি করব না। আমার ধুতি আর জামা দেব। কাজে লেগে যাবে।"

চিত্রা এতক্ষণ জামাকাপড়গুলো ছাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। এবার ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে দেখে চলে গেলেন। অন্য কোনও সময় হলে উনি বসতেন। আজ সময় নেই। আজ থেকেই উনি আরশিনগরের লাইব্রেরিতে যোগব্যায়ামের কাজ শুরু করে দেবেন। সময় অনেক পিছিয়েছে। সকাল দশটা থেকে লাইব্রেরির হলে ক্লাস শুরু হবে। চলবে বেলা বারোটা অবধি। অনেকেই নাম লিখিয়েছে। তারমধ্যে শালু আর বলাকাও আছে।

কদিনের মধ্যেই শালুর নতুন ডিউটি শুরু হল। লাঠি বানাবে ও। বন থেকে গাছ খুঁজে নিয়ে কাজ সারতে হবে ওকে। হেনাদিরা কিছুদিন হল ভাবছেন সবার ঘরে কিছু না কিছু অস্ত্রশস্ত্র রাখলেই ভালো। ওই ছেলেটার পড়ে থাকা দেখে অবধি তারা বড় চিন্তায় আছেন। তাই সবার হাতে একটা লাঠি অন্ততঃ তুলে দিতে চান। শান্তদাকে কথাটা জানানো হয়েছে। উনি আপত্তি করেননি। বললেন, "সাপ মারতেও লাঠি লাগে। বনবাদাড়ে বাস। সাপের বদলে আরো হিংস্র জন্তুর দেখা মিলছে যখন, লাঠি রাখাই ভালো। নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি না হলেই হল।"

ওনার কথাটা বলার পেছনেও একটা কারণ আছে। কথাটা ভাবছিল ঝুমুর।

শালু আর ভূষণদার সম্পর্কটা সাপ আর নেউলের মত। দুজনে দুজনকে দুচক্ষে দেখতে পারেনা। অথচ দুজনেই ভীষণ কর্মপটু। যেকোন কাজে আরশিনগরের সবাই, ওদের ওপর চোখ কান বুজে ভরসা করে।

সেদিন ঝুমুরদের বাড়ি এসে ভুষণদা বলল, "শালুটার কোন আক্কেল নেই। তোমরা ছেলেমানুষ বায়না করেছ বলেই নাহয় দোলনা বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু টাঙানোর সময় দেখবে না? সরু একটা ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে কাজ শেষ। যেকোন সময় ডাল ভেঙে হুড়মুড়িয়ে পড়বে তোমরা। তখন হাত পা ভাঙলে কী হবে ভেবেছ?" শালুর কানে মনুয়া কথাটা তুলে দিতে, সেদিন এসে কী হম্বিতম্বি!

"দিনদিন বুড়োটার বেকার বকা বেড়ে যাচ্ছে। দেখেশুনেই দোলনা ঝুলিয়েছি আমি। আগে ভাঙুক, তারপরে যেন বলে।"

ঝুমুরদের খুব মজা লাগে ওদের রাগাতে। সেদিন শালু এসেছিল ওদের দুটো লাঠি দিতে, মনুয়া ওকে বলেছিল, "ভূষণদা দারুণ খিচুড়ি বানায়। ভাবছি একদিন খিচুড়ির পিকনিক করব। ভূষণদাকে রাঁধতে বলব।"

শালু সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমাদের ডেকো না। ভূষণদা মোটে রাঁধতে পারেনা।"

"সেদিন যে খেলে?"

"খেয়েছি বলেই বলছি তো।"

ঝুমুর আর তর্ক করেনা। ওরা স্পষ্ট দেখেছিল, খাওয়ার পর শালু আর বলাকা হাত চাটছিল।

কদিন হল ঝুমুররা খুব ব্যস্ত আছে। এখন ওদের কাজের চাপ বেড়েছে। ওই আহত ছেলেটাকে ওষুধ খাওয়ানো, গরম জলে তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করে পায়ে মলম লাগিয়ে দেওয়া, সময়মত খেতে দেওয়া, সব ওরাই করে। প্রায় দু'সপ্তাহের মত ডাক্তারবাবু নিজে এসেছিলেন। একদিন অন্তর ওই গুলি লাগা জায়গাটা গজ ঢুকিয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে গিয়েছেন। খানিকটা সামলে যাবার পর ওদের বুঝিয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন। এখন ঘাটা শুকিয়ে আসছে। ওরাই যা করার করে দেয়। ভূষণদা গা মুছিয়ে মাথা ধুইয়ে দিয়ে যায়। অসুবিধে হচ্ছে জায়গার। একটা ছোট ঘরে ওরা গাদাগাদি করে আছে। ছেলেটাকে বড় ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু এসব ছোটখাটো বিষয়ের চেয়ে ভাবার ব্যাপার হল, ছেলেটা এসে থেকে একটাও কথা বলেনি। ব্যথার জায়গায় লাগলে আঃ উঃ করা ছাড়া কোনও আওয়াজ পর্যন্ত করেনি। তবে কিছু বললে কথা শোনে। যাতে বেশ ভালোই বোঝা যায় কালা নয়। সম্ভবতঃ বোবাও নয়। ওরা শান্তদার অপেক্ষায় আছে। উনি এলেই যা বলবার বলবেন।

ডাক্তারবাবু বলেছেন, "এখন এভাবেই চালিয়ে যাও। হয়ত মানসিক ধাক্কা থেকে এমন করছে। কিংবা ইচ্ছে করেই চুপ করে আছে। দেখা যাক। একটা অসুস্থ মানুষকে তো আর বেশি জোরাজুরি করা যায়না। সময় এলেই সবটা বোঝা যাবে।"

আরশিনগরের কাউকেই ছেলেটার কথা বলা হয়নি। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে বাড়িতে তেমন কেউ এলে ওরা ওই দরজা ভেজিয়ে দেয়। তবু ভয়ে ভয়ে থাকে ঝুমুররা, তেমন কেউ এলে কীকরে ঠেকাবে? ভুষণদা সবসময় এবাড়িতে থাকেনা। থাকলেও একা সবটা সামলাতে পারবে তো?

# #

এর মধ্যে আরশিনগরে এক পাগলের আবির্ভাব হল। লোকটার চুলে জটা, বিশাল আলখাল্লার মত পোশাক, দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে খালি বলছে, ধরলাম, ধরলাম। তারপর নিজের মনে হাততালি বাজাচ্ছে।

এখানে কোন বাড়িতেই দরজা দেবার অভ্যাস নেই। পাগলটা সব বাড়ির দরজা খুলে ঢুকে পড়ছে। আবার তাড়া খেয়ে বেরোচ্ছে।

ঝুমুর আর মনুয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। ভূষণ তাড়াতাড়ি এসে কী দেখল কে জানে? ওদের ভেতরে যেতে বলে লাঠি নিয়ে দাঁড়ালো। অদ্ভুত ব্যাপার লাঠি হাতে দেখে আর ঢুকল না লোকটা। ঘরে ঢুকে ওরা দেখল নিজের বিছানায় ছেলেটা নেই। খুঁজতে খুঁজতে ওদের নজরে এলো রান্নার জন্য কাটা কাঠের স্তূপের পেছনে লুকিয়ে বসে আছে।

ভূষণদা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘরে নিয়ে এল। তারপরেও কাঁপছিল ছেলেটা। ভূষণদা আড়ালে ওদের বলল, "ওই পাগলটা একটা খোঁচড় হবে। খবর নিতে এসেছিল। ওর গলার আওয়াজ শুনেই এ কেমন ভয় পেল দেখলে? তবে আমি ওভাবে তাড়িয়ে ঠিক করিনি। ওরা আবার এই বাড়িটা দেখতে আসতে পারে। একে এবাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। আর রাতে সজাগ থাকতে হবে।"

ঠিক সেদিনই সন্ধেবেলা শান্তদা এসে হাজির। সব শুনে ওষুধ, কাপড়চোপড় সমেত ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেলেন গাড়ি করে। কোথায় নিয়ে যাবেন, সেটা ওরা জানতেও পারল না। ঝুমুর একটু উস্‌খুস্‌ করছিল। বড় ঘরটা ভরে আছে চলে যাওয়া মানুষটার জিনিসপত্রে। গরম জলের জন্য চিত্রাদি বড় গামলা দিয়েছিলেন। সেটা এককোণে খাড়া করা। ডাক্তারবাবুর দেওয়া একটা কাপড় দড়ির আলনায় ঝুলছে। এছাড়া তুলো, ডেটল সব তাকে গুছিয়ে সাজানো। সবচেয়ে বড় জিনিস যা রয়ে গিয়েছে, তা হল, অনুপস্থিত মানুষটার শরীরের গন্ধ। সারা ঘর সেই গন্ধে ম' ম' করছে। ছেলেটা চলে যেতে সবকিছু কেমন ফাঁকা লাগছে।

রাতে খেতে বসে ঝুমুর, মনুয়া রুটি তরকারি নাড়াচাড়া করছিল। গলা দিয়ে নামাতে পারছিল না। ভূষণ খাওয়া সেরে, জলের ঘটিতে কয়েকঢোঁক জল খেয়ে বলল, "তোমরা ঘাবড়াচ্ছ কেন? ছোঁড়ার খবর ঠিক এনে দেব।"

ঠিক দুদিন পরেই এলো ছেলেগুলো। তখন সন্ধে পেরিয়েছে। সবে সাতটা বাজে। ঘরে হ্যারিকেন জ্বেলে ঝুমুর পুরনো কাঁথাটার ছেঁড়া জায়গাগুলোর ওপর আবার নতুন ফোঁড় তুলছিল। আর মনুয়া চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে রাখছিল। ভূষণদা এসময়টা থাকেনা। পুরনো দিনের সিনেমা আর্টিস্ট বাসন্তীবালার বাড়িতে সাতটা থেকে ভজন শুরু হয়। সেখানে রোজ ওকে যেতেই হবে।

দরজা দেওয়া ছিল। হঠাৎ কড়াটা নেড়ে জানান দিলে মনুয়া গিয়ে খুলে দিয়েছিল। ওকে প্রায় ঠেলে বাড়িতে ঢুকেছিল তারা। হাল্কা জলপাই রঙের পোশাকে গা হাত পা সব ঢাকা। মুখে গামছা জড়ানো বলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

কোনও কথা না বলে মনুয়ার পাশ দিয়েই জুতো মশ্‌মশিয়ে ভেতরে ঢুকে সব ঘরগুলো ঘুরে এল একজন। বাকিরা কুকুরের গন্ধ শোঁকার মত চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ভাগ্যিস ছেলেটা চলে যাবার পর ওর থাকার সব চিহ্ন লোপাট করা হয়েছে। ওরা ওকে বা ওর থাকার প্রমাণ খুঁজছিল। ওই কাঠের গাদাও বাদ গেলনা।

আগেই একজন ওদের ইশারা করে ঘরের বাইরে পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছিল। সব দেখেশুনে নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল জুতো পরা লোকটা। ওই বোধহয় ওদের নেতা।

"এখানে কোনও গুলি খাওয়া লোককে জঙ্গল থেকে তুলে আনা হয়েছিল?" চোখে চোখ রেখে লোকটা প্রশ্ন করে।

"তুলে আনা হয়নি। তবে একজন আমাদের বাড়িতে ঢুকেছিল। আমাদের ভয় দেখিয়ে একরাত ছিল।" ঝুমুর কিছু বলার আগেই মনুয়া উত্তর দেয়।

"কোথায় সে?"

"পরদিন ভোরে উঠেই তাকে আর দেখতে পাইনি। দরজা খুলে রেখে চলে গেছিল। কেন সে তোমাদের কেউ?" মনুয়ার সাহস, গড়গড়িয়ে মিথ্যে বলা, অবাক করে দিচ্ছিল ঝুমুরকে।

"চুপ। একদম চুপ। একটাও বেশি কথা বলবে না। সে কোথায় গেছে জানো?"

"বললাম তো ভোরে উঠে দেখি দরজা হাট করে খোলা। সে নেই। কিরে তাই না ?" বলে ঝুমুরের দিকে তাকায় মনুয়া। ঝুমুর ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ে।

"আমরা কী করে জানব সে কোথায় গিয়েছে?" মনুয়া গলার আওয়াজ একটুও কমায় না।

"চল। আর দাঁড়িয়ে কী হবে?" ওই লোকটা বলতেই ওর সঙ্গীরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায়। লোকটা যেতে যেতে ফিরে আসে। মনুয়া আর ওর দিকে তাকিয়ে বলে, "চলে যাচ্ছি। যদি জানতে পারি মিথ্যে বলেছ, ফল ভাল হবেনা কিন্তু।"

ওরা চলে যেতে উঠোনের ধাপিতে ধপ্ করে বসে পড়ে ঝুমুর। মনুয়া ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। "এতেই এত ঘাবড়ে গেলি? আমার মত মেয়ে চালানকারীদের হাতে পড়লে কী করতিস ?"

রাতে ভূষণদা এসে আফসোস করে। "আমি থাকতে থাকতে কেউ এলোনা? তাহলে মজা বুঝিয়ে দিতাম।"

মনুয়া হাসে, "ওদের সবার হাতে মেসিন ছিল। বীরত্ব দেখাতে গেলে তোমার অবস্থা ওই ছেলেটার মত বা আরো বাজে হত। ভাগ্যিস ছিলেনা।"

শান্তদা অন্যবার কয়েকদিন থাকেন। দেখাশোনা হয়। এবারে সেদিন রাতটাই যা ছিলেন। পরদিন ভোরেই চলে গিয়েছেন। ছেলেটাও ভ্যানিশ্! খুব রাগ হয়েছিল ওদের। এতদিন ধরে ছেলেটা তো ওদের এখানেই ছিল। তাহলে ওদের এভাবে অন্ধকারে রাখা কী ঠিক হল? কোথায় গেল ছেলেটা ওদের অন্ততঃ বলতে পারতেন। বিষয়টা নিয়ে দুজনে গুজগুজ ফুস্ফুস্ করলেও ভূষণদা কিভাবে যেন টের পেয়ে খুব ধমকালো ওদের। "তোদের কচি মাথার বুদ্ধি নিয়ে তোরা শান্তর বিচার করছিস? ও কী ভেবে কী করে তা ওই জানে। তবে ভুল কিছু যে করেনা, সে ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।"

শান্তদার ব্যাপারটাই এরকম। আরশিনগরের সবাই কোনও না কোনও ভাবে শান্তদার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই শান্তদার সমালোচনা করার কথা কেউ ভাবতে পারেনা। ওদেরও কখনও সেটা মাথায় আসেনি। আসলে ওই হঠাৎ করে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ায় ওরা যতটা না কষ্ট পেয়েছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হল সেটা না জানানোয় খুব আঘাত পেয়েছে। তবু মনেমনে ওরাও স্বীকার করে, শান্তদাকে নিয়ে কোনও আলোচনা করাই ঠিক নয়।

কথা হচ্ছিল রাতে শোবার ঘরে। ছেলেটা চলে যাবার পর বড় বিছানার চাদর পালটে ওরা আবার পাশাপাশি শুয়েছে। কথাটা তখনই উঠল। মনুয়ার সঙ্গে এতদিন ধরে এখানে আছে ঝুমুর, কখনও জানতে চায়নি ও কিভাবে এখানে এলো। মনুয়ার কথাতেই পুরনো ইতিহাসের দরজা খুলে গেল।

ঝুমুর পাশ ফিরে চুপচাপ মনুয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। এখানে ইলেকট্রিক নেই। খুব গরমেও পাখা চালানো যায় না। সরস্বতী পুজো এগিয়ে আসছে। তাই বাতাসে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। এখন ঘুমটা আরাম করেই হয়। ওপাশে শুয়েছে মনুয়া।

ঘরে কেরোসিনের বাতিটা কমানো। ঝুমুর অন্ধকারে একদম শুতে পারেনা। তাই একটা জানলা সামান্য ফাঁক করে ল্যাম্প জ্বালিয়ে শোয় ওরা। অল্প আলোয় মনুয়ার মুখটা কেমন অন্যরকম লাগছিল। চোখদুটো বোজা। কয়েকটা ঝুরো চুল কপালে লুটিয়ে। টিকালো নাকে নাকছাবিটা চিকচিক করছে। কেমন চড়ুই পাখির মত ছোট মুখ। ঝুমুর ভাবছিল, দেখে তো মনে হয় না। এই মেয়েটার অত সাহস?

তখনই চোখ খুলল মনুয়া। "কী দেখছিস অত মন দিয়ে?"

ঝুমুর উত্তর দেয় না, নজরও সরায় না।

ঝুমুর যখন এখানে আসে, মনুয়া চিত্রাদি বা হেনাদির বাড়িতে ঘুরে ঘুরে থাকত। হেনাদিই এই বাড়িটা ব্যবস্থা করে দিয়ে ওদের দুজনকে একসঙ্গে থাকতে বলেন। মনে করেছিলেন দুজনে প্রায় সমবয়সী, একসঙ্গেই ভালো থাকবে। হয়েছেও তাই। দুজনে ওরা বেশ আছে। মাঝেমাঝে মনে হয় আর কেউ এলে যেন জায়গা কুলোবে না। তবে একটা দূরত্ব মেনে চলে ওরা। নিজেদের দুঃখময় অতীতের গল্প কেউ কারুর কাছে করেনা। কতদিন মায়ের মুখ দেখেনি ঝুমুর। মাঝেমাঝে মায়ের জন্য কান্না উথলে ওঠে ওর। তখন মনুয়ার কাছে মায়ের কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সাহস করে বলতে পারেনা। বলতে গেলেই ওই বিশ্রী লোকটার কথা উঠবে। মায়ের সঙ্গে ওই লোকটার সম্পর্কের কথা ভাবলেই বড় ঘেন্না করে ওর। তাই মনুয়ার কাছে আর কথাটা তোলেনি।

তাছাড়া মনুয়াও তো কিছু বলেনি ওকে। এত গল্প হয়,কখনও ওই অতীতের প্রসঙ্গে যায়না। কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল, সে ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখে। এতদিন বাদে মেয়ে চালানকারীদের কথা হয়ত মুখ ফসকেই বলে ফেলেছে।

মনুয়া বোজা চোখ খুলে আবার বন্ধ করায় পাশ ফিরে মায়ের কথা ভাবছিল ঝুমুর। নবীনাদি অনেকদিন আসেনি। এলে ও মায়ের খবর পায়। নবীনাদি স্কুলে নিয়মিত যায় যে পথে, সেই পথেই একটা কালীমন্দির আছে। সেখানে পুজো দিতে যাবার নাম করে মা নবীনাদির সঙ্গে মন্দিরেই দেখা করে নেয়। তখনই ওর ভালোমন্দের খবর মা পায়। আর মায়ের খবরও নবীনাদি জেনে আসে। এভাবে কতদিন চলবে কে জানে? মা জানে ও কোনও আশ্রমে আছে। এই "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার"এর খবর মা রাখেনা।

নবীনাদিকে ও বলেছিল, "মাকে এখানে এনে দেবে?"

নবীনাদি বলেছিল, "তাহলে তোকে বাঁচানো যাবেনা। তাই ও আশা করিস না।"

তবু আশা ছাড়তে পারে কই?

ও শুয়ে শুয়েই টের পেল ওর গায়ে মনুয়া হাত রেখেছে। ওকে টেনে নিজের দিকে ফেরাল মেয়েটা। তারপর কেমন একটা অন্যরকম গলায় বলল "আমার আসল নাম সীমা। এখানে আমি নাম বদল করেছি। মামার বাড়িতে থাকতাম। বাবা আমার জন্মের একবছর পরে টিবিতে মারা যায়। বাজি কারখানায় কাজ করত। চিকিৎসা করায়নি ঠিকমত। মামারা নানারকম ধান্দা করে সংসার চালাত। মা আর আমি তাদের বাড়িতে আসার পর দুটো খাইমুখ বাড়ে। গায়ে গতরে খেটে আর না খেয়ে মা সেটা পুষিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার দশ বছর বয়সে মা চলে গেল। তারপরেও লাথি ঝাঁটা খেয়ে টিঁকে ছিলাম ওখানেই। বিক্রি হয়ে যাওয়াটাও টের পাইনি, এতটাই বোকা ছিলাম।"

"বিক্রি করেছিল, তোকে? কে?"

"কে আবার? আমার খচ্চর ছোটমামা।"

"আবার মুখখারাপ করছিস। তোকে বারণ করেছি না।"

"তোর বারণ শোনে মনুয়া। এখন তো সীমা কথা বলছে।" কথাটা বলে খিলখিলিয়ে হাসে মেয়েটা। এই এক দোষ ওর। প্রতি কথায় হাসে।

"হাসছিস কী বলে? এটা কী হাসির কথা?"

"হাসির নয়? একটা পনেরো বছরের বাপ মা মরা বাচ্চা মেয়ে, মামীর বাসন মেজে, কাপড় কেচে, দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। দশটা বাজলে স্কুলের দেওয়া ড্রেস আর মোজা কেডস্ পরে দৌড়তে দৌড়তে স্কুলে যায়। তাকে মেলায় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে রঙিন জল খাইয়ে নিজের মামা তুলে দিল মেয়ে বিক্রির দালালের হাতে। সেই দালালের সঙ্গে যেতে যেতে জ্ঞান

ফিরল কৃষ্ণনগর স্টেশনে। তখনই ভয় পেয়ে বিকট চেঁচামিচি শুরু করল মেয়েটা। ওই দালালকে তো ও চেনে না। যতই ভালো ভালো কথা বলুক, ভালোমন্দ খেতে দিক, ওর সঙ্গে সীমা যাবে কেন?"

"তারপর? তুই ফিরে গেলি বাড়িতে?"

"না। মেয়েটা বুঝেছিল, ওর কোনও বাড়ি নেই। চেঁচানোর পরে লোকজন ওকে উদ্ধার করে। নিয়ে যায় থানায়। পুলিশের বড়বাবুকে নিজের দুর্দশার কথা বলে ওখান থেকে সোজা হোমে গিয়েছিল ও।"

"পড়াশুনো?"

"ওই হোমে থাকতে থাকতেই প্রাইভেটে মাধ্যমিকের দড়িটা পেরোনো হয়েছিল শুধু। আর নয়। ওই ঢের তো।"

"তা সেখান থেকে এখানে এলি কীকরে?"

"সব গল্প একদিনে শুনে নিবি? সেটি হচ্ছে না। তোর কথা শুনব না?" মনুয়া আবার হাসে।

ঝুমুর বলে, "বড় লজ্জার গল্প যে। কীকরে বলি?"

মনুয়া এবার চুপ করে যায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "ওই ঘটনার থেকেও খারাপ? না শোনাই ভালো তাহলে।"

ঝুমুর শুরু করে শেষের দিক থেকে বলতে। ও প্রথমেই বলে ওর নবীনা দিদিমনির কথা। কিকরে এখানে এলো, প্রথম প্রথম কেমন লাগত এখানে, সেইসব। তারপরে বলে মাকে ছেড়ে আসা, না দেখতে পাওয়ার ভীষণ মনখারাপ আর অসহ্য কষ্টের কথা। সবশেষে বলে এখানে আসার কারণ, আর কেমন ছিল সেইসব দুর্বিপাকের যন্ত্রনার দিন। শেষের কথাগুলো বড় লজ্জা বড় অপমানের। মনুয়া চুপ করিয়ে দেয় ওকে। বলে, "থাক্, আর বলিস না। মনেমনে ভাবতাম বাবা মা অল্পবয়সে গেছে তাই এত দুঃখ! আজ বুঝলাম আমার ভাবাটাই ভুল। আসল হল কপাল। যার নাম গোপাল।" বলে আবার জোরে জোরে হাসে ও।

আর ঝুমুর বোঝে হাসি শুধু আনন্দের নয়, কষ্টেরও হতে পারে।

##

স্কুলের কাজ, বাড়ির কাজ, বিদেশকে নার্সিংহোমে সঙ্গ দেওয়ার কাজ, সারাদিন কাজে কাজেই কাটে। তার মধ্যেই শান্তদার ফোন। "সামনের সপ্তাহে আমি যাচ্ছি, তুমি যাবে নাকি?"

শান্তদা এভাবেই বলেন, বুঝে নিতে হয়। সেরকম দরকার না থাকলে বলেন না। কাজেই না বলার কোন অবকাশ থাকেনা। ও বোঝে আরশিনগরে কিছু হয়েছে বা হতে চলেছে। যে ব্যাপারে ওর থাকাটা জরুরি। এদিকে ঝুমুরের বাবার খুব আস্পর্ধা বেড়েছে। ওর পেছনে লোক লাগিয়েছে। ওকে দু'একদিন ফলো করছিল কেউ। টের পেয়ে ন্যাকাবোকা সেজে দোকানে বাজারে ঘুরেছিল ও। লোকটা আর আসেনি।

পিসিমনির শরীর একটু ভালো, তবে সবটা নয়। বুকে সর্দির জন্য ডাক্তার দেখায়নি। নিজে নিজেই বাসকপাতা তুলসী দিয়ে একটা কী কাথ বানিয়ে চুমুক দিয়ে বারদুয়েক খেয়ে আরাম পেয়েছে। এখন রান্নাঘরে যাবার বায়না ধরেছে। জ্বালাতন করছে খুব। তারই মধ্যে ওকে বালিশের নীচ থেকে একটা চিঠি বার করে দিল। পড়ে ছিঁড়ে ফেলিস।

লোকরঞ্জনের শাসানোর চিঠি। পোস্টবক্সেই ছিল।

বেনামী হলেও ইঙ্গিতটা জোরালো – "এসব কাজকর্ম না ছাড়লে দেখে নেব।"

হাসি পায় ওর। কাকে কী বলছে ওরা? ওর হারানোর কী আছে?

শান্তদাকে বলতেই বললেন, "কী করবে নিজে ঠিক কর।" তারপরেই ভাবনাটা আসে ওর। লোকরঞ্জনের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলতে হবে। তবে ও একা যাবেনা। চন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

অদ্ভুত ব্যাপার। সাবধানী চন্দনা, এককথায় রাজি হয়ে গেল। দুজনে মিলে যাবে শুনে বড়দি একটু আপত্তি করছিলেন। "লোকটা তো সুবিধের নয়। সোজাসুজি গিয়ে ধরলে তোমাদের ক্ষতি করে দেয় যদি?"

ওনার কথা শুনলে ভয় পেয়ে পিছোতে হয়। হার্ডওয়ারের দোকানেই যাবে বলে ঠিক করল। বাড়িতে যা খুশি ব্যবহার করতেই পারে। কিন্তু দোকানে অন্য খদ্দেরদের সামনে অসভ্যতা করতে গেলে ভাবতে হবে। খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। খবর নিল ওরা। মোটামুটি সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো, আর বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নটা অবধি লোকটা দোকানে থাকে।

সকালে স্কুল। বিকেলবেলা স্কুল ফেরৎ যাবার কথাই ভাবল। সাড়ে চারটেয় ছুটি হয়। কিছুটা সময় স্কুলে কাটিয়ে ঠিক পাঁচটায় দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চন্দনা,ও নিজে, দোকান দেখে বেশ অবাক! খুব বড় দোকান! কর্মচারীর সংখ্যাও বেশি। ওদের আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে যেতে লোকরঞ্জন একটু হকচকিয়ে গেল। নবীনা বুঝল ওকে চেনে লোকটা।

প্রথমে অবশ্য একগাল হেসে বলল, "ও দিদিমনিরা, আসুন আসুন। বসুন আপনারা। এই কে আছিস, দুটো চেয়ার দিয়ে যা।"

নবীনা গম্ভীর ভাবেই বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো? বড়দি বললেন, আপনি দুদিন গিয়েছিলেন স্কুলে। আপনার মেয়ে ঝুমুরকে পাওয়া যাচ্ছেনা। আপনার ধারণা তার হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। হঠাৎ এরকম উল্টোপাল্টা ধারণা করছেন কেন, সেটা জানতেই এলাম।"

"উল্টোপাল্টা? ও আপনার ভক্ত ছিল না? ওর চলে যাওয়ার পেছনে আপনার মদত থাকতেই পারে।" লোকরঞ্জন ঠান্ডা গলায় উত্তর দেয়।

"স্কুলের অনেক মেয়েই আমার ভক্ত। কিন্তু তাদের গার্জেনরা কেউ আমার নামে বলতে স্কুলে ছোটেননি। আর ওর তো মা গার্জেন। আপনি তো গার্জেনই নন। যেটা বলতে এলাম, কিছু জানার থাকলে স্কুলে যেন ওর মা যান। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। আসি তাহলে।"

কর্মচারীদের সামনে লোকরঞ্জন বেশি কথা বাড়াল না। লোকটার চেহারায় ধূর্ততার ছাপ স্পষ্ট। আর এমন লোভীর মত দৃষ্টি দিয়ে সারা শরীর চাটে, খুব খারাপ লাগে!

চন্দনা বলছিল, "তুই পারিস বটে। ওই ধুরন্ধরকে যে হারে ঝাড়লি, কল্পনার বাইরে। আমার ওর মুখের গনগনে ভাব দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল।"

"ও আবার শয়তানি করবে। পাক্কা শয়তান একটা!" কথাটা বলতে বলতে নবীনা নিজেই হেসে ফেলে। চন্দনা চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসে। তুই সাবধানে থাকিস। লোকটা একদম সুবিধের নয়।

বাড়ি ফিরে নবীনা অবাক হয়ে যায়।শান্তদা বাইরের ঘরে বসে চা বিস্কুট খাচ্ছেন। পিসিমনি মোড়া টেনে সামনেই বসেছে। হাত পা নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে শান্তদাকে। ওকে দেখে চুপ করে যায়।

"আপনি কখন এলেন? একটা ফোন করবেন তো?"

"এই কিছুক্ষণ। আমি বসছি। তুমি স্কুল থেকে ফিরলে, সময় নাও। সব প্রয়োজন মিটিয়ে চেঞ্জ করে এসো। আমি অপেক্ষা করছি। একটু কাজের কথা আছে।"

ও ভেতরে যেতে যেতে ভাবছিল, সমস্যা সাধারণ নয়। শান্তদা বাড়ি বয়ে এসে হাল্কা কিছু বলার লোক নন। কী ঘটল তবে?

"বিদেশ নার্সিং হোম থেকে পালিয়েছে।" শান্তদা একটু বেশি শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন কথাটা।

"মানে? কী বলছেন?"

"আমাকে ফোন করেছিল নার্সিংহোম থেকে। দুপুরের লাঞ্চ খেয়েছে। তারপর শুয়েছিল। বিকেলের নার্স এসে বিছানায় না পেয়ে ভেবেছে বোধহয় টয়লেটে গিয়েছে। তারপরেই খোঁজ শুরু হয়। দেব খুব হতাশ! চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছিল।"

"কী বলছেন? ওই অসুস্থ শরীর নিয়ে গেল কোথায়?"

"জানিনা। তবে শরীর খানিক সুস্থ হয়েছিল। তোমায় বলতে এলাম এইজন্য যে ও হয়ত তোমার কাছে আসবে। খোঁজ পাওয়া যাবে তাহলে। তাই তোমাকে এখন ওখানে নিয়ে যাচ্ছিনা। উঠি। কোন খবর পেলে জানিও আমায়।"

শান্তদা চলে গেলেন। ও ভাবছিল সন্ধে নামছে। ছেলেটা পালিয়ে গেল কোথায়?

মাঝেমাঝে ওর ভারি অবাক লাগে। কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে হঠাৎ করেই কেমন গাঢ় বন্ধন তৈরি হয়, একেবারেই বিনি সুতোয় গাঁথা হয়ে যাওয়া মালার মত। সে এসে সামনে দাঁড়ায় আর অন্য সবকিছু আড়ালে চলে যায়। বিদেশের সঙ্গে একটু আধটু সৌজন্য বিনিময় হত। ভাল মন্দের খোঁজখবর, মৌখিক কথার ভাববিনিময়। ওই অসুখের সময় ছেলেটা বড়ই কাছাকাছি এসে গেল। এতটা কাছে যে ওর চলে যাওয়ার খবরটা একটুও স্বস্তি দিচ্ছে না। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

রাতে ভাল করে খেতে পারছিল না ও। পিসিমনি এসে দুধে রুটি মেখে দিতে গলা দিয়ে নামাল কিছুটা। নাহলেই কৈফিয়ত দিতে হবে, কেন খাচ্ছেনা। ওদিকে সারা দিনের কাজের নমিতা মেয়েটা ওকে দেখেই কামাই করতে শুরু করেছে। মামারবাড়ি, মেলাতলা, কিছু বাকি রাখছে না। পিসিমনি সেই সুযোগে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ছে। সবকিছু মিলিয়ে ও ভারি বিপদে পড়েছে। পিসিমনিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারেও রাখা যাচ্ছে না। আবার পুরোটা বললে তিনি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন।

পরদিন সকালে কাজের মেয়েটা গেট খুলে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "তোমাকে কে একজন ডাকছে।"

ও বাইরে এসে খুব রাগ করছিল, "লোকটাকে বসিয়ে রাখলে না কেন? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা।" ঠিক তখনই নজরে এল বাগানের সিঁড়ির সামনে কেউ একজন বসে আছে। বিদেশ ছাড়া আর কেই বা হবে?

ও সামনে গিয়ে একটু রূঢ় ভাবেই বলল, "এখানে এলে কী করে? ঠিকানা পেলে কোথা থেকে?"

মাথা নামিয়ে বসেছিল বিদেশ। ওর কথা শুনে উঠে দাঁড়াল। একদিনেই বিধ্বস্ত চেহারা। চান, খাওয়া, কিছুই জোটে নি মনেহয়।

অসহায় দৃষ্টি মেলে নীচু গলায় বলল, "চলে যাচ্ছি। তাই তোমাকে দেখতে এলাম। হ্যাঁ ঠিকানাটা তুমিই দিয়েছিলে।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। যাচ্ছ কোথায়? কাল কোথায় ছিলে?"

"না। দাঁড়াব না। আসি। গতকাল কোথায় ছিলাম ভুলে গেছি।"

নবীনা গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। "চল। রাগ দেখানো হচ্ছে। নিজের মতে আসা যায়। যাওয়া যায় না। যাবে আমার মতে, বুঝলে।"

নবীনা পেছন ফিরে দেখে পিসিমনি এসে দাঁড়িয়েছে। ও খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলে, "এই বিদেশ। আজ থেকে এখানেই থাকবে। রান্নার দিদিকে বলো ওর জন্য দুটো বেশি চাল নিতে।"

বিদেশ আর যায়না। ওর পেছন পেছন ঘরে ঢোকে।

নবীনা ভাবে যতক্ষণ না শান্তদা নিতে আসছে, ওকে এখানেই আটকে রাখতে হবে।

# #

হেনা একটু অস্থির হচ্ছিলেন। সামনেই সরস্বতী পুজো। লাবণী মূর্তি গড়েছে। ভারী সুন্দর সেই মূর্তি। দেবীর মুখ আর হাতের বীণাটি ভারি পছন্দ হয়েছে তার। কিন্তু পুজোর গোছগাছ কিছুই করা যাচ্ছেনা। মীরা হঠাৎ চলে যাবার পর কাজেকর্মে ভাঁটা পড়েছে সকলের।

শালু, দেবীর জন্য কারুকার্য করা যে কাঠের বেদী বানিয়েছে, সেটা অপূর্ব! দেবী মূর্তি বেশি বড় নয়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একহাতে বীণা। অন্যহাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তোলা। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কথা বলবেন। কিন্তু কথা শোনার লোক কই? চিত্রা বলছিল, "মীরা চলে গেল। ঝুমুরদের বাড়িতে বন্দুকধারীরা হামলা করল। এবারে পুজো বন্ধ রাখলে কেমন হয়?"

পুজোর জন্য লাইব্রেরিতে মিটিং ডাকা হয়। সেখানেই ওঠে কথাটা। পুজো বন্ধের প্রস্তাবে কেউ রাজি হলনা। সারাবছরে একটি দিনই তো। কোন কারণেই কেউ পুজোর আমোদ বন্ধ করতে চায়না। লাবণী কথা বলতে পারেনা। তাই মিটিং এ চুপ করে বসে ছিল। "শান্তদা এলেই সিদ্ধান্তে আসা যাবে" বলে সবাই মিটিং মুলতুবি রাখা ইস্তক হেনা একটা কথাও বললেন না।

হেনা বসেবসে ভাবছিলেন পুজো নিয়ে। বয়সের কারণে তিনি আর তেমন পরিশ্রমের কাজ করে উঠতে পারেন না। পুজোর সময় ফল কাটা, ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজানোর মত যাবতীয় কাজ করত মীরা। চিত্রা বলেছে ও এবারের পুজোয় কোনও কাজে হাত দেবে না। মীরা নেই বলে এবারে ও পুজো বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল। সেটা কেউ শোনেনি। কিন্তু ও সিদ্ধান্তে অটল। এবারের পুজোয় নিজেকে আর জড়াবে না।

শান্তর ওপর সকলের আস্থা। ও না আসা অবধি কোন কিছুই ঠিক করা যাচ্ছেনা। ঠান্ডা বেড়েছে। হেনাদের ভোরে পথে বার হওয়া আপাততঃ বন্ধ। এখন বিকেলে ঠিক চারটেয় দুই বন্ধু বার হন। আবার পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় ফিরে দুজনে বসে চা খান। চা খেতে খেতেই উঠল কথাটা।

হেনা অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন চিত্রার মুখের দিকে। বাইরে বেরিয়ে ফিরে দুজনে দুটি মোড়ায় বসেছেন। এখনও চা খাওয়া শেষ হয়নি।

হেনা গলা নামিয়ে চিত্রাকে বললেন, "তোমার কী হয়েছে আমায় বলবে? পুজো বন্ধের প্রস্তাব দিলে, সেটা নাহয় মীরার জন্য। কিন্তু সবাইকে তুমি যা পারো বোঝাও, আমি ভুলছিনা। কিরকম যেন আনমনা হয়ে আছ। হলটা কী?"

চিত্রা তবু চুপ করে বসে থাকেন। হেনা ওঠেন। দুকাপ চা নিয়ে আবার ফিরে আসেন। চিত্রা চায়ে চুমুক দিয়ে তাকান হেনার দিকে। "মিঠুর বিয়ে হয়েছিল বলেছিলাম তোমায়। ওর বাচ্চা হবার কথা ছিল। কিন্তু সে আর পৃথিবীর মুখ দেখল

না। মিঠুর খুব মনখারাপ। তার থেকেও বড় কথা ওই কারণের সঙ্গে আমার দুর্নাম জড়িয়ে ওর বর ওকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

"সম্বন্ধের বিয়ে?"

"হ্যাঁ। তুমি তো জানো আমার শ্বশুরবাড়ি কেমন গোঁড়া গোবিন্দ টাইপের। মিঠুর সঙ্গে একটি ছেলের আলাপ ছিল। সাধারণ চাকুরে, মোটামুটি অবস্থা। মিঠু নিরীহ। তাই ওর পছন্দকে বাতিল করে জোর করে এই বাড়িতে ওর বিয়ে দিয়েছিল ওরা। এরা একেবারেই ওদের মনের মত। অবস্থাপন্ন। শিক্ষা আছে, দীক্ষা নেই। ফলে যা হবার তাই হল।"

"তুমি এত কথা জানলে কিভাবে?"

"আমার ভাগ্নে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। মিঠুর সঙ্গেও ওই আমায় কথা বলিয়ে দিত।"

"তুমি ছেড়ে চলে এলে, তাও মেয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলত?"

"বরাবর বলে। ওর চোদ্দ বছর বয়সে ওকে আমি ছেড়ে আসি। বলেছিলাম, "আর সহ্য হচ্ছেনা। হয় চলে যাব, নয় মরে যাব।"

ও বলেছিল, "মা,তুমি চলে যাও। বেঁচে থাকলে তবু ইচ্ছে হলে তোমার সঙ্গে দুটো কথা হবে। আমি এদের সঙ্গে ঠিক থাকতে পারব। আমার জন্য চিন্তা করো না।" বলতে গেলে ওর কথাতেই আমার বাঁচার ইচ্ছে হয়। আমি চলে আসতে পারি।"

হেনা বলেন, "তোমার মেয়ে আছে জানতাম। সঙ্কোচে কোনদিন কিছু জানতে চাইনি। তা বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে তো তোমার।"

"বুদ্ধি আছে। তবে বড় বেশি নির্বিবাদী। নিজের মত চালাতে শেখেনি। তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে।"

"সবাই একরকম হয়না। ওর ওতেই শান্তি।"

"মেয়েকে কী বলব তাই ভাবছি। ভাগ্নেকে বলেছি আমি ওর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আমায় একটু বুদ্ধি দেবে? ওকে কী বলব বল তো? খুব ইচ্ছে করছে এখানে নিয়ে আসার। কিন্তু সেটা কী উচিত হবে?"

হেনা হাসেন। তারপর তাকান চিত্রার দিকে। "এসব বুদ্ধি দেওয়া যায় কি? তুমি যা ঠিক করবে সেটাই ভাল হবে। তুমি ওর মা। জানি এসব সময়ে কেউ পাশে থাকলে ভরসা পাওয়া যায় । চিন্তা করোনা। আমি আছি তোমার পাশে।"

"তাহলে ওকে এখানে নিয়ে আসব?"

"আমার মনে হয় সেটা এক্ষুণি করলে একটু তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে। ডিভোর্স হতেও তো সময় লাগবে। ওকে ভাবতে দাও। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ওর সমস্যা, কষ্টটা, বুঝতে দাও। এখন তুমি কিছু করলে বদনামের ভাগীদার হবে। কাজের কাজ কিছু হবেনা।"

"মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করছে। আমার কিছু ভালো লাগছে না।"

এবার হেনা অবাক হয়ে তাকান চিত্রার দিকে। "তুমি একথা বলছ? এখানে প্রথম আসি আমি আর তুমি। তারপর শান্তর আসাযাওয়া শুরু হল। এক এক করে কত মানুষ জড়ো হল। বাসন্তীবালা এসেছিলেন আমাদের ঠিক পরেই। মনে আছে?"

"আছে। শান্ত এসে অনেক পরিকল্পনা করল। সেগুলো একে একে কার্যকরী হল। এখন তো অনেক ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা থাকতাম বরফের গুহার সন্ন্যাসীদের মত। একদম মরিয়া। বাঁচা মরার পরোয়া নেই। সমাজ সংসার পরিত্যাগ করে শুধু টিঁকে থাকা।"

"তবে? সেই দিনগুলো তোমাকে মনে করালাম। সেদিনের নির্লিপ্তি আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে তো? নাহলে এখানে আছি কেন?"

চিত্রা মাথা নিচু করেন। "চেষ্টা করব। 'নাড়ি ছেঁড়া ধন' কথাটা মিথ্যে নয়। একটু বেশিই উতলা হয়ে পড়েছিলাম।"

"আচ্ছা বিদেশের কোনও খবর পেলে?" হেনা জানতে চান। "সে যাওয়ার পর থেকে কোন খবরই পাইনি তো।"

"আমিও জানিনা। শান্ত এলে জানা যাবে। ও দু'একদিনের মধ্যেই আসবে হয়ত।"

চিত্রা যত্ন করে হেনার বাগানের গেট আটকে দেন। ভারি সুন্দর বাগান। ফুল ফল দুই আছে। নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে ঝুমুরদের বাড়ির দিকে হাঁটেন। ওদের খবরও নিতে হবে। ওই ঘটনার পর মেয়েগুলো একা একাই আছে। ভূষণের থাকা না থাকা একই ব্যাপার। সন্ধেবেলা ওর আড্ডা মারতে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। চিত্রা ওদের বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ান। বাড়ির গেট খোলা। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে আটকানো।

উনি দরজায় নক্ করতে করতে চেঁচান। "দরজা খোল। আমি। চিত্রাদি।"

তারপর কী মনে হতে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে যায়। ভোঁ ভাঁ! এরা সব গেল কোথায়? এখনও অন্ধকার নামেনি। সন্ধের আবছা আলোয় সবকিছু বড় মায়াময় লাগে। ওদের বাড়ির উঠোন পরিষ্কার। ঝক্‌ঝক্ করছে। কিন্তু দুই মক্কেলের একজনও নেই।

হঠাৎ পেছনে আওয়াজ হতে চিত্রা দেখেন দুজনে কাঠের বোঝা টানতে টানতে আসছে। ঝুমুরের আর একহাতে ঝুড়িতে টোপা টোপা কুল।

"চিত্রাদি, কুল খাবে?" ঝুমুর একগাল হেসে বলে।

চিত্রা ভ্রু কোঁচকান। "সরস্বতী পুজোর আগে আমি কোনদিন কুল খাইনা।"

"আমরাও না। এনেছি। আচার বানাব।"

চিত্রা আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান। মিঠু ছোটতে টক কুল খেতে খুব ভালবাসত। কাশিতে নাজেহাল হত। তবু কুল খাওয়া ছাড়ত না।

চিত্রা চলে যেতেই মনুয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে। "তুই কী মিথ্যে কথাই না বলতে পারিস। দিব্যি বলে দিলি আচার বানাবি। তোর পেটে কি আচার তৈরি হবে?"

ঝুমুর পা ছড়িয়ে বসে ধোওয়া কুল খাচ্ছিল। ঠিক তখনই শালু এলো, সঙ্গে বলাকা। ওরা দুজনেই হাঁফাচ্ছে। শালু এসেই দরজা দিয়ে দিল। "এই আরশিনগরের সুখের দিন শেষ হতে চলল।"

"কেন?" মনুয়া কৌতূহলী হয়।

বলাকা বলতে শুরু করলে ওকে থামায় শালু। "তোমাকে কিছু বলতে হবেনা। আমি বলছি। তোরা একাএকা ওই জঙ্গলে ঢুকিস না যেন। তেমন বড় বড় জন্তু নেই ঠিকই। কিন্তু তার থেকেও ভয়ানক কিছুই ওখানে বাসা বেঁধেছে। তোরা ওই বনে যাসনা।"

তারপরে বলাকা বলে কেমন "সারি সারি তাঁবু দেখেছে ও। অন্য কোনও উদ্দেশ্য না থাকলে এখানে তাঁবু টাঙাবে কেন?"

"ওই তাঁবুতে লোক দেখলে তোমরা? মানে কারুকে ঢুকতে বেরোতে দেখলে?" মনুয়া জানতে চায়।

"দেখলাম তো। জলপাই রঙের পোশাক পরেছিল। মেয়েও আছে দলে।" বলাকা বলে।

"কিন্তু আমরা কিছু দেখলাম না তো। এই একটু আগেই তো গিয়েছিলাম।" ঝুমুর হাসে। "আমরা তো কাঠ নিয়ে এলাম। কুল পাড়লাম গাছ থেকে। কাউকে নজরে পড়েনি। তোমরা কতদূর গিয়েছিলে?"

"আমি আর বলাকা মাঝেমাঝেই যাই। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূরেই চলে যাই। ওই জঙ্গলে একটা মন্দির আছে। কোনও কোনও দিন ওই ভাঙা মন্দির পেরিয়েও এগোই আমরা। নদী ওখানে বাঁক ঘুরেছে। ভারি সুন্দর জায়গাটা। ওখানে গিয়ে বসে থাকি।"

ঝুমুর আর মনুয়া হাঁ করে শুনছিল ওদের কথা। বলাকা গায়ের ওড়নাটা পেছনে ঠেলে বলে, "আজ যাওয়া যায়নি। যেতেযেতেই মনে হচ্ছিল বনে কেউ আছে। বন একেবারে ফাঁকা নয়। তবু গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগোলাম। তখনই নজরে এলো তাঁবুগুলো। আমাদের খুব মনখারাপ হয়ে গিয়েছে। ওই নদীর ধারে হয়ত আর কোনওদিন যাওয়া হবেনা।"

মনুয়া বলে, "আমাদের আগে কোনওদিন বলতে পারতে। আমরাও তোমাদের সঙ্গে গিয়ে নদী দেখে আসতাম। এখন খুব ইচ্ছে করছে একবার যাই। কিন্তু ওরা থাকলে ...।"

শালু বলে, "না একদম না। ওখানে যাওয়া খুব রিস্কের হয়ে যাবে। আমার কাছে তবু এই কুঠারটা ছিল। জানি ওদের ওইসব আধুনিক মেসিনের কাছে এটা কিছুই না। তবু দরকারে কাজে লাগত। কিন্তু তোমাদের খোলা হাতে আর কিছু নিয়ে যাওয়া একই ব্যাপার। ওখানে যাবার কথা ভেব না কখনও ।"

ঝুমুর ম্লান হাসে, "ভাবব না কেন? ওরা কী চিরকাল ওখানে থাকবে নাকি? তখন যাব। কখনও ভেবেছিলাম এই আরশিনগরে আসব? এসেছি তো। হয়ত আমাদেরও যাওয়া হবে ওই নদীর ধারে। না এখন না। কোনও একদিন।"

উঠোনে বসে কথা হচ্ছিল। ওদের কথার মাঝেই শালু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলাকার দিকে ফিরে বলে, "এই চল।"

বলাকা হাসে। "দাঁড়াও। আগে আমি কুল খাব, তারপর যাব।"

"এখন কুল?" শালু অবাক হয়। সরস্বতী পুজোর আগেই ...।"

"কোন শাস্ত্রে আছে যে সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেতে নেই।" কথাটা বলতে বলতেই বলাকা পা ছড়িয়ে জুত করে বসে। ঝুমুর কুলের ঝুড়ি এগিয়ে দেয়।

বলাকা একটা কুল মুখে পুরে চেঁচায়, "উঃ! কী টক রে বাবা! নুন দে শিঘ্রি। আজ নদী,মন্দির, কিছু দেখতে পাইনি। কী ভাগ্যিস, এখানে এলাম। তবু, কুল খাওয়া হল।"

# #

বিদেশকে একটা ঘর খুলে দিয়েছে নবীনা। ঘরটায় ও পড়াশুনো করত। দেওয়াল আলমারি ভর্তি বই। একটা পড়ার টেবিল, চেয়ার, দুটো মোড়া আর একটা দুজনের শোবার মত খাট, দরজার পেছনে জামাকাপড় ঝোলানোর রড ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। ওই খাটের বিছানায় এসে থেকে শুয়ে আছে বিদেশ। ওর শরীর তেমন ভাল নেই মনে হয়। দুপুরে খুব তৃপ্তি

করে খেল। পিসিমনির হাতের মাছের ঝোল, পোস্ত, বিউলির ডাল খেয়ে বলছিল, "অনেকদিন বাদে এত তৃপ্তি করে খেলাম। মার হাতের রান্নার মত সোয়াদ। আমাকে এখানে থাকতে দেবে নবীনা?"

কথাটা পিসিমনির সামনেই বলেছিল। পিসিমনি পছন্দ করেনি।

নিজের মনেই গজগজ করছিল, "এরকম উটকো ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়ার কোন মানে হয়? কোথাকার কে, এল, খেল, ঠিক আছে। তা নয়, এখানেই থাকার বায়না।"

ও অবশ্য বলেছিল, "পিসিমনি, ওর শরীর ভালো নয়। মন আরো খারাপ। এখানে দুদিন থেকে যদি আনন্দ পায়, ওর মন ভালো হয়, আমি আপত্তি করব না। তুমি মন ছোট করো না। ও যদি তোমার এসব কথা শুনতে পায়, হয়ত চলে যাবে।"

কথাটা বলার পরও পিসিমনি জানতে চাইছিল, "এখানে ও কতদিন থাকবে কিছু বলেছে?"

নবীনা উত্তর দেয়নি। ও ভাবছিল পিসিমনি একটা সময়ে খুবই দুরবস্থায় ছিল। তখন নবীনার বাবা ওকে নিয়ে আসেন। বাড়িতে আশ্রয় দেন। যদিও পিসিমনি নবীনাকে দেখেশুনে রেখেছিল, তবু একটা কোথাও তো ওটা সাহায্য ছিল। সেটা পিসিমনি ভুলল কী করে? আজ আরেকজনের বেলায় আপত্তি করছে।

ওই বিষয়টা মাথা থেকে বার করে দেওয়ার জন্যই ও ফোন করল চন্দনাকে। খানিকটা হাবিজাবি বকার মধ্যেই চন্দনা জানাল, লোকরঞ্জন বড়দির সঙ্গে দেখা করে ওদের নামে নালিশ করেছে। ওরা কেন দোকানে গিয়েছিল, ওটা ওর কাজের জায়গা। এতে ওর অসম্মান হয়েছে।

বড়দি নাকি বলেছেন, "আমি কারো ঠিকা নিয়ে বসে নেই। ওরা ওদের দায়িত্বে গিয়েছেন। আপনিও স্কুলে এসে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে আমার শিক্ষকের নামে নালিশ করেছেন। এবার বুঝুন।"

উনি নাকি তাও গ্যাঁট হয়ে বসে কথা বলে যাচ্ছিলেন। বড়দি তখন বলতে বাধ্য হন "আমার ক্লাস আছে। এখন উঠতে হবে।"

লোকটা এতটাই খারাপ, তারপরেও বলেছে "আমার মেয়েকে না পাওয়া অবধি আমি স্কুলে আসবই। আপনি আমায় ঠেকাতে পারবেন না।"

এসব কথার মাঝেই শান্তদার ফোন এলো। আসলে ও বারবার শান্তদাকে করেছে। পায়নি। উনি কোনও মিটিংএ ব্যস্ত ছিলেন।

বিদেশের আসার খবর আগেই দিয়েছিল ও। নবীনার বাড়িতে ওর ভাললাগার কথা শুনে শান্তদাও খুব খুশি হয়ে বললেন, "ওকে তোমার বাড়িতে কদিন রাখতে পারবে? তাহলে হয়ত এই বিষাদের ভাবটা ও কাটিয়ে উঠতে পারবে।"

"কিন্তু ওর চিকিৎসার কী হবে? এভাবে তো ওর রোগ সারবে না।"

"দেখি কী করি। দেব তো আর ওকে রাখতে চাইছে না। আমাকে বলল, "এরকম রুগীকে রাখব কী করে? পালিয়ে গেলে কি আর তার চিকিৎসা হয়? তাছাড়া আমরা তো পুলিশ রাখিনা। ওকে কে পাহারা দেবে?" তাই ভাবছি কী করা যায়।"

"তাহলে কী হবে? এখন বুঝছি এরকম মানসিক অবস্থা বলেই ও আরশিনগরেও স্বস্তি পেতনা। কিন্তু ওকে ডাক্তার তো দেখাতে হবেই।"

"ঠিক আছে। ও এখন যেমন আছে থাক। আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ওকে নিয়ে আসব। বিদেশকে নিয়ে আসার পর তুমি আরশিনগরে গেলে আমায় জানিও। আমি প্রায়ই যাচ্ছি। তোমায় নিয়ে যেতে পারব।"

শান্তদার কথা শেষ হবার পর ও চুপ করে বসে ভাবল, শান্তদার ওপর কত কাজের ভার। তবু এতটুকু অস্থির হননা। সমস্যা হলে একটা সমাধান ঠিক বার করে ফেলেন। আর ও, দুদিন বিদেশকে রাখার দায়িত্ব নিতেই ঘাবড়ে যাচ্ছে। না, এই আচরণ একদম ঠিক হচ্ছে না। ওকে আর একটু শক্ত হতে হবে। পিসিমনির কথায় ভয় পেয়ে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেলে চলবে না।

কিন্তু শেষে ঘাবড়ে দিল বিদেশ। এমন অদ্ভুত কান্ড করবে যে ও ভাবতেও পারেনি। রাতে বিদেশের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সকালে পিসিমনি সবচেয়ে আগে ওঠে। বাইরের দরজা খোলে। কোলাপসিবিলের তালা, তারপরে গেটের তালা সব একে একে খোলা হয়। পিসিমনি উঠে সব খুলে দেবার পর কাজের মেয়েটা আসে। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙল নবীনার, পিসিমনির হাউমাউ চিৎকারে।

"দেখে যা কী কান্ড! সব দরজা খোলা। ওই ছেলেটাও নেই।"

ঘটনাটা ও শুনল পিসিমনির কাছেই। ঘুম ভেঙে যাবার পর বাথরুম সেরে পিসিমনি দরজা খুলে বাগানে ফুল তুলতে যাচ্ছিল। তখন সাড়ে ছটা হবে। দরজায় হাত দিয়ে ঘাবড়ে যায় মানুষটা। সেটা শুধু ভেজানো। কোলাপসিবিলের তালা বাইরের ঘরের টেবিলের ওপর চাবিশুদ্ধু রাখা। গেটের তালা খুলেও একটা গেটে তালা লাগিয়ে চাবি টেবিলের ওপরেই রেখেছে কেউ। প্রথমে মাথায় চোরের চিন্তা এলেও পরে ভাবনা চিন্তা করে বিদেশের ঘরে গিয়েছিল পিসিমনি। বিছানা ফাঁকা দেখে ভয় পেয়ে ওকে ডাকাডাকি করছে।

বারান্দার একটা হুকে চাবি ঝোলে। ওখান থেকে চাবি নিয়ে কান্ডটা ঘটিয়েছে ও।

বিদেশের ওপর প্রথমে খুব রাগ হল নবীনার। পিসিমনির কাছে ওকে বিচ্ছিরিভাবে অপদস্থ হতে হল শুধুমাত্র ওর জন্য। পিসিমনি তো যা নয় তাই বলতে শুরু করল। নবীনা গম্ভীরভাবে বলল, "এত হইচই করার কিছু হয়নি। আগে ওর খবর পেতে দাও। ও অসুস্থ যে সেকথা তোমাকে হাজারবার বলেছি। তুমি এখনও সেটা বুঝতে পারছ না।"

পিসিমনি খুব নির্বিকার ভাবে বলে, "একটা অসুস্থ ছেলের দায় তোকেই বা নিতে হচ্ছে কেন, বুঝছিনা। ওর নিজের লোক কেউ নেই?"

"সত্যি সত্যি নিজের কেউ থাকলে কি ও আমার কাছে আসে? তোমাকে বুঝিয়ে কোন লাভ নেই। শুধু এইটুকু বলছি, যতদিন না আমি ওকে যেতে বলব, ও এখানেই থাকবে। বোঝাতে পারলাম?"

গোমড়া মুখে পিসিমনি চলে গেল ওখান থেকে। ওর কথাটা যে পছন্দ হয়নি তা বেশ ভালোই বুঝেছে নবীনা। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। আসলে পিসিমনি ওকে ভালোরকম চেনে। জানে যে কোনকিছুতে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে ওকে চট করে নড়ানো যায়না।

নবীনা মনেমনে ভাবছিল একবার রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজবে বিদেশকে। তারপর ভাবল থাক, দেখাই যাক। নিজে থেকে আসে কিনা। বেলা তখন এগারোটা হবে, বিদেশ ফিরে এল। নবীনা গম্ভীর হয়ে ছিল। কিছু বলেনি। ও নিজে থেকেই বলল, "একটু দরকারে বেরিয়েছিলাম। তোমরা সকলেই ঘুমোচ্ছিলে। তাই বলে যেতে পারিনি।"

"কোথায় গিয়েছিলে? বলা যাবে আমাকে?"

"বলব। তবে এখন নয়।"

নবীনা দেখে দরজার কাছ থেকে একটা মানুষের ছায়া সরে গেল। পিসিমনি। দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। ও বোঝে সেটা বিদেশও খেয়াল করেছে। তারমানে ছেলেটার ভালোরকম সেন্স রয়েছে। ও বিদেশকে বলে, "বেলা হয়েছে। স্নান করে এসো। তোমাকে খেতে দিয়ে দেব। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি তো।"

বিদেশ স্নান খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে। ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে ঢুকে স্নান করতে করতে ভাবছিল নবীনা, বিদেশ ওর কেউ নয়। তবু কেমন মায়া গজিয়েছে ছেলেটার ওপর। অথচ বিদেশে থাকাকালীন নিজের স্বামী শৈবালের ওপর ওর কোনও মায়াই তৈরি হলনা। শরীর দিয়েছে ক'বার, মন দিতে পারেনি। শৈবালের চিন্তা মাথায় কখনও এলে ও সরিয়ে দেয়। অথচ বিদেশের শরীরের দুরবস্থার জন্য ওর রীতিমত চিন্তা হয়।

শৈবালের অসভ্যতা সহ্যের সীমা ছাড়াল, যেদিন ও "আঃ তু তু" করে ডেকেছিল ওকে। প্রতিবাদ করার প্রবৃত্তি হয়নি ওর। ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। লঙ ডিস্ট্যান্স কলে ও সব কথা জানিয়েছিল বাবাকে।বাবা বলেছিলেন, "চলে আয়। আমি টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিয়ে হয়েছিল বাবার সিদ্ধান্তে। তখন ও এম এ তে ভাল ফল করে নেটের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কলেজে পড়ানোর ইচ্ছে। বাবার কথায় সে সব স্বপ্ন ছেড়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল ও। এখন ওর যেটুকু আফসোস সবটাই ওই নিজের সিদ্ধান্ত ছেড়ে বাবার কথায় বিয়ে করা নিয়ে। ডিভোর্সের পরে বাবা বারবার বলেছিলেন, আবার বিয়ের কথা। ওকে দেখতে ভাল, কোয়ালিফিকেশান আছে, চেষ্টা করলে বিয়ে হতেই পারত। ও নিজেই রাজি হয়নি।

ওখান থেকে ফিরে আসার পর মন এতটাই ভেঙে গিয়েছিল, নেটে আর বসা হয়নি। মনে হত তখন, জীবনে আর কিছু করার নেই। ওর কথা ভেবে ভেবে নিজের কৃতকর্মের জন্য আফসোস করতে করতে বাবা চলেই গেলেন।

বাবা থাকতে থাকতেই স্কুলের চাকরি। আরশিনগরের যাতায়াত বাবার মৃত্যুর পরে শুরু হয়েছে। শান্তদার সঙ্গে দেখা না হলে এত সাহস, এত ইচ্ছে, আবার গজাত কি? বিদেশকে কী ভাবে এপথে টেনে আনা যায় ভাবছিল ও।

বিদেশ ঘুম থেকে উঠল বিকেল পেরিয়ে। চায়ের ট্রে তে চা বিস্কুট নিয়ে নবীনা ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বিদেশকে। ছাদে ওর ছোট একটা বাগান আছে। মূলতঃ গোলাপের গাছ লাগায় ও। বড় বড় লাল, হলুদ, গোলাপী গোলাপে ছাদ আলো হয়ে আছে। বিদেশ একেবারে কাছে গিয়ে গোলাপের গন্ধ শুঁকছিল। তারপর চা খেতে খেতে ওকে মায়ের গল্প করছিল।

বিদেশের মা খুব সূক্ষ রুচির বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। ছেলেকে নিজের হাতে শার্ট বানিয়ে পরাতেন। চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হোক। কিন্তু বিদেশ আপত্তি করায় সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তারপরের সংসারজীবন ওর খুব সুখের হয়নি। হেনাদির যোগসূত্রে এই আরশিনগরে আসা।

চা খাওয়ার ব্যাপারে বিদেশের তেমন আগ্রহ নেই। তবু গোলাপবাগানের মধ্যিখানে বসে খুব আয়েশ করে চা খেল ও। দু'একটা ছেলেবেলার গল্প শোনাল। অবাক হয়ে যাচ্ছিল নবীনা বিদেশের ঠাকুমার কথা শুনে। তিনি যে অত বড় সংসার চালিয়েও বই পড়তেন, সেলাই – ফোঁড়াই করতেন, সারাক্ষণ গুনগুন করে ঠাকুরের ভজন করতেন, শুনে নবীনার খুব উৎসাহ এল মনে।

ও নিজে থেকেই বলল "আমি একটা গান করি।" বলেই, "মায়া বন বিহারিনী হরিনী" গানটা ধরল ও। বিদেশ মন দিয়ে শুনল, তারপর ওকে অবাক করে দিয়ে নিজে থেকেই গাইল, "গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।"

ওর ভরাট গলার গান শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিল নবীনা। তারপর জানল একদম ছোট থেকেই বিদেশ গানের চর্চা করে। স্কুল, কলেজের ফাংশানে বন্ধুদের আবদার রাখতে অনেক গানই গেয়েছে। গান গাওয়ার সময় ওর থেকে চোখ সরায়নি বিদেশ। যেন গানের বাণীর কথাগুলো ওকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন কবি। ওর মনোভাব না বোঝার মত বোকা নবীনা নয়। তবু না বোঝার ভান করে ওর গানের অনেক প্রশংসা করল ও।

গান হয়ে যাবার পরও চুপ করে বসেছিল দুজনে। বিদেশ বলল, "তুমি জানতে চাইলে না তো আমি সকালে দরজা খুলে কোথায় গিয়েছিলাম?"

"কোথায় গিয়েছিলে আবার? আত্মীয় বা কোনও নিকট বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।"

"না নবীনা। ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ নেই। আমি গিয়েছিলাম আমার ছেলেকে দেখতে।"

"কোথায়?"

"ওর স্কুলে। আমি জানতাম যাহোক কিছু বলে লাভ নেই। তুমি মিথ্যেটা ধরে ফেলবে ঠিকই।"

"ওকে দেখতে পেলে?"

"পেলাম। ওর সঙ্গে ওর মা ছিল। তাই আর কাছে যাইনি। তাছাড়া ওই ক্লাসের অন্য গার্জেনরা উপস্থিত ছিল। ওদের সামনে আমি দেখা দিলেই ওরা নানান প্রশ্ন করে আমার ছেলেকে ব্যতিব্যস্ত করত।

"তোমাদের ডিভোর্স হয়েছিল?"

"না। তার আগেই আমি আরশিনগরে চলে যাই।"

"কোনও আইনত বিচ্ছেদ হয়নি ? তাহলে গোপা এখনও তোমার স্ত্রী? ডিভোর্স করোনি কেন?"

"ছেলের জন্য বলতে পারো। সবাই ওকে আমাদের ডিভোর্স নিয়ে কথা শোনাতো। ওর মনে লাগত তো। তাছাড়া আমি চাইনি গোপা আবার বিয়ে করুক। ওকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম।"

"সেকি? গোপার অন্যায় কোথায় দেখলে? হ্যাঁ বিবাহিত থাকাকালীন অন্য কারুর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ঠিক নয়। কিন্তু কেউ যদি অন্য কোনও সম্পর্কে যায়, সেখানে ভালো থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে ছেড়ে দেওয়াই তো উচিত।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। ওকে মুক্ত করে দেওয়াই আমার কর্তব্য। দেখি, উকিলের সঙ্গে কথা বলি।"

প্রায় বছর দুয়েক তোমাকে আরশিনগরে দেখছি। এর আগে ছিলে কোথায়?"

কেন বাড়িতে। তবে আমার চাকরিটা এমন ছিল সারাক্ষণ বাইরে বাইরে ঘুরতে হত। তাই বাড়িতে না বলে বোধহয় পথেই বলা ভালো।

আরশিনগরে আসাটা একদমই হঠাৎ করে। বিয়ের দুবছর পরে ছেলে। ছেলের তখন তিনবছর বয়স, হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম গোপার অন্য সম্পর্ক আছে। খুব একটা বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতাম না। নিজের সংসার নিয়ে বেশ খুশি ছিলাম। অতবড় ধাক্কাটা, মানে গোপার দ্বিচারিতা ...। আমি সত্যি তখন নিজেকে সামলাতে পারিনি।"

"সেটা যে তোমার খুব বড় ভুল একথা বলব না। ওরকম হতেই পারে। আমার জীবনের ধারাও বেশিটাই পালটে গিয়েছে আমার বিয়ের পরে। যদিও একেবারে ছোটতেই আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তবু বিয়ের পর একজন নিষ্ঠুর বিকৃত রুচির মানুষের শারীরিক মানসিক অত্যাচারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আমার সবকিছু শেষ হতে বসেছিল। তাই তোমার কষ্ট আমি বুঝি। তবু এসব কষ্টের ওপরে ওঠা কিছু কিছু মানুষকে দেখে আমার মনে হয়েছে এসব কিছুই না। এ শুধু আমাদের দুঃখ বিলাসিতা। অনেকে আমাদের থেকেও বিপন্ন। তাদের দেখে আমাদের শেখা উচিত।"

বিদেশ হাসে। তারপর বলে, "ভালো ছাত্র ছিলাম। আমাদের দোষ কী জানো, অর্ধেক কথা থেকেই আমরা সামারি করতে পারি। তুমি আমাকে কী বলতে চাইছ তা আমি আগেই বুঝেছি। আর বিস্তারিত হতে হবেনা। তোমাকে একটা কথা বলি, ওই নার্সিংহোমে থেকে আমি তোমার এখানে অনেক ভাল আছি। অনেক সুস্থ বোধ করছি। চারপাশের ঘোলাটে ভাবটা

কেটেছে। আজ ছেলেকে দেখে আমার মনে হয়েছিল ওদের কাছে যাই। ওকে একবার বুকে চেপে ধরি। নিজেকে সংযত রেখেছিলাম অতি কষ্টে। তবে গোপাকে দেখে আমার কোন কষ্ট হয়নি। কেমন যেন দূরের মানুষ মনে হল। এই বোধটা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। আমি ওর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি অবশেষে। আর সেজন্য বোধহয় তোমার কাছেই আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী।"

নবীনা উঠে পড়ে। "তুমি এখানেই বসো। আজ তোমার সুস্থতার শুভউদযাপনের জন্য আর একরাউন্ড চা পান হবে। আমি আয়োজন করে আসি।"

বিদেশ চুপ করে বসে রইল একা। আকাশের ছড়িয়ে থাকা তারাদের দিকে তাকিয়ে ওর খুব কান্না পাচ্ছিল। যেন অনেকদিন একটা বদ্ধ জায়গায় ও আটকে ছিল। ছিপি খুলে দিয়েছে কেউ, আর হু হু বাতাসে ও ভেসে যাচ্ছে। বিদেশের মনে হচ্ছিল এভাবেই চুপচাপ বসে থাকাটা কী যে শান্তির! কতদিন যে ও এরকম অনুভব করতে পারেনি।

# #

ভূষণ বনের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছিল। এখানে যে আরেকটা বসতি শুরু হয়েছে, আর সে লোকগুলোর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনওরকম সংযোগ নেই, সেকথা বুঝতে ওর দেরি হল না। সবুজ পোশাক পরা কিছু মানুষ ঘোরাফেরা করছে। তারা সকলেই পুরুষ নয়। মহিলাও আছেন। তাদেরও শরীরে একই রঙের শার্ট প্যান্ট। ভূষণ উবু হয়ে বসেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ও সকালের বিশেষ কাজ সারতে এসেছে।

আসলে ঝুমুরদের কাছে ও এব্যাপারে কিছু খবর পায়। ঠিক বিশ্বাস হয়নি। তাই আজ ভোরভোর নিজে সব দেখতে এসেছে। ওর চোখে পড়ল ওইদিক থেকে কালো ধোঁওয়া উঠছে। তাহলে এখানেই বাস করছে কিছু মানুষ। তারা রান্না করে খাচ্ছে। এই জঙ্গলেই রাত কাটাচ্ছে।

ভূষণ নিজের মনেই নানারকম চিন্তা করছিল। এরা কারা? এখানে এলো কেন? এদের উদ্দেশ্য কী? হঠাৎ ওর মনে হল এই লোকগুলো খুব সুবিধের নয়। এরা যদি জানতে পারে ও এখানে বসে ওদের লক্ষ্য করছে তাহলে ফল ভালো হবে না। হয় ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেবে। নয় ওকে মেরেই ফেলবে। ভাবতে ভাবতেই ও দেখল একটা সবুজ পোশাক পরা লোক এদিকেই আসছে। কাছাকাছি এলেই ওকে দেখতে পাবে। ভূষণের ঠিক পাশেই মাটি ঢালু হয়ে নেমেছে নীচে। ও শরীর গড়িয়ে নিজেকে সেদিকে নিয়ে যেতে যেতে ভাবল নীচেও কিছু থাকতে পারে। সাপ খোপ বা বিষাক্ত অন্য কিছু। সেখানেও বিপদ হবার ষোল আনা চান্স। তবে বিপদজনক মানুষের হাতে পড়ার থেকে বিষাক্ত প্রাণীর মোকাবিলা করা ভালো। নীচের ঢালু মাটিতে পড়ে থাকা ভূষণ নিজের গায়ে নারকেল পাতা জড়াচ্ছিল। ওপরের লোকটার চলে যাওয়া টের পেয়ে হাঁচোড় পাঁচোড় করে ওপরে উঠে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দৌড় দিল। জঙ্গল শেষ হতেই আরশিনগর। ঝুমুরদের বাড়িতে পৌঁছে মাটিতে বসে হাঁফাচ্ছিল ও। ঝুমুর জল নিয়ে এগিয়ে এল।

ভূষণ এমনিতেই একটু পেট পাতলা মানুষ। কোনও নতুন কথা জানলে ভূষণের পেট ফোলে। সেখানে এরকম একটা অভিজ্ঞতার কথা না বলে থাকে কি করে? ঝুমুর ওকে বলেছিল, "ভূষণদা,ওই জঙ্গলের খবর তুমি কাউকে বলো না। ওই লোকগুলোর কানে যদি কোনওভাবে কথাটা যায়,ওরা খুব খারাপ কিছু করতে পারে। আমরা জানিনা তাই ওরা নিশ্চিন্তে আছে। আমরা জানলে ওদের ভয় বাড়বে। তার ফল মারাত্মক হতে কতক্ষণ।"

ভূষণ তবু নিজেকে সামলাতে পারেনি। খোদ বাসন্তীবালাকেই ও বলেছিল কথাটা। বাসন্তীবালাকে বড়ই পছন্দ ভূষণের। পুরনো যুগের নায়িকা। তবে অভিনয়ে খ্যাতি থাকতে থাকতেই সবকিছু ছেড়েছুড়ে সিনেমা জগতের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সেসবের পেছনে বড়সড়ো কিছু কারণ থাকতেই পারে। এখানে কিভাবে এলেন ও জানেনা।

একটু ভারী চেহারা। গায়ের রঙ গোলাপী ফর্সা। হাসলে গালে টোল পড়ে। চোখ,নাক, ঠোঁট সব নিখুঁত সুন্দর নাহলেও সব মিলিয়ে এই পঞ্চান্ন বছর বয়সেও ভারী সুন্দর মানুষটি। ওনার ব্যবহারও খুব মিষ্টি। ভূষণের সঙ্গে এত আন্তরিক ব্যবহার করেন যে ভূষণ মুগ্ধ হয়ে যায়। তবে এবারে ঘটনাটা অন্য রকম ঘটল। উনি রীতিমত ভয় দেখালেন ভূষণকে।

"ওইসব মানুষেরা কতটা সাংঘাতিক হতে পারে আপনার ধারণা আছে? আমাকে যা বলেছেন বলেছেন, আর কারো কাছে এনিয়ে মুখ খুলবেন না যেন। নিজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলেরও বিপদ ডেকে আনবেন তাহলে।"

ভূষণের মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই এলেন শান্তদা। জঙ্গলে ওর ঢোকা নিয়ে বকুনি দিয়ে বললেন, "যা হয়েছে হয়েছে,একদম কারো কাছে এ নিয়ে কিছু বলো না। তুমি নিশ্চয়ই চাওনা আরশিনগরের মানুষেরা বিপদে পড়ুক। সেদিন সন্ধ্যায় লাইব্রেরীতে মিটিং ডেকে শান্তদা সবাইকে সন্ধের পর বাড়ির প্রধান দরজায় তালা দিতে আর জঙ্গলে না ঢুকতে বলে দিলেন। মনে হল সবাইকার তাতে রীতিমত মত আছে। সকালে ঝুমুর ভাবছিল সবাই কেমন অম্লানবদনে মানুষটার আদেশ পালন করে। এশবার কার্যকারণ জানার প্রয়োজনও মনে করেনা। ওরা নিজেরা অবশ্য ওই ঘটনার পর সবসময়েই বাড়িতে তালা দিচ্ছে। কাঠ নিতে এদিককার জঙ্গলেও ঢোকেনি।

মনুয়া বলল, "আমার তো মনে হয় আমরা ওদের যেমন ভয় পাচ্ছি, তেমনি ওরাও আমাদের ভয় পাবে। হয়ত খুব শীঘ্রই পাততাড়ি গুটোবে। বলিস তো আমিই গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পারি ওরা আছে না গেছে।"

কথাটা শুনে ঝুমুর খুব রাগ করল। "তোর সবেতেই পাকামী। শান্তদা বারণ করেছে তো। গিয়ে দ্যাখ, আমি বলে দোব।"

সরস্বতী পুজো এসে গেল। এখন রাতে বেশ ঠান্ডা নামে। সকালে আবছা কুয়াশায় পথঘাট ঢাকা পড়ে যায়। ওদের আলোচনার সময় ভূষণ বসে ছিল এশপাশে। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিমডালে দাঁত মেজে এইভাবে একপাশে ও বসেই থাকে। ঝিমোয়। ঝুমুর চা দিলে, খেয়ে বাইরে বেরোয়।

চটকা ভেঙে ও বলল, "ভুলেও ওখানে যেওনা কেউ। আমি বলে তাই পালাতে পেরেছি। তোমাদের পেলে ওরা আটকে দেবে, নয়ত মেরে দেবে। আর ফিরে আসা হবেনা।"

মনুয়া হাসে, "ভূষণদাও ঝুমুরের মত ভয় পেলে দেখছি। তাহলে তো আমাকে যেতেই হয়।"

মনুয়ার এই স্বভাবটা বরাবরের, কাউকে রাগাতে পেলে ও সে সুযোগ ছাড়েনা। আরশিনগরের ভিজে হাওয়ায় ওর এই রঙ্গ রসিকতার স্বভাব কিছুটা হলেও বদল আনে। মীরাদির মৃত্যুর পর আরশিনগর কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। সন্ধে শুরু হত মীরাদির ভজন দিয়ে, সেই গান আর শুনতে পাওয়া যায়না। মাঝেমাঝেই মীরাদি দুপুরে ঠাকুরের ভোগ খেতে নেমন্তন্ন করত ঝুমুর আর মনুয়াকে। বেশি কিছু নয়, আতপচালের খিচুড়ি, ভাজা আর চাটনি। মীরাদির রান্নার গুণে অমৃতের মত লাগত ওদের। জোর বৃষ্টি হলেই মীরাদির কৃষ্ণ খিচুড়ি খেত, আর ওরা তার প্রসাদ পেত। তুলসী এসে বলে যেত "আজ দুপুরে মা খেতে ডেকেছে তোমাদের। এসো।"

সরস্বতী পুজোয় চিত্রাদি নিজে সুন্দর করে আলপনা দিত। ঠাকুরের ঘর নেই। ওই খোলা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণেই মাথায় একটা ছাউনি দিয়ে পুজো হয়। সেখানে সবার বাড়ি থেকে ফুলে ভরা টব এনে সাজিয়ে দিত। মীরাদির কথামত ওরা শান্তদার শহর থেকে এনে দেওয়া ফল মিষ্টি কাটত। ঠাকুরের সামনে সেসব সাজিয়ে নিবেদন করতেন মীরাদি। আরশিনগরের প্রায় সবাই যোগ দিত পুজোয়।

এবারে লাবনী প্রতিমা গড়েছে। প্রতিবার শহর থেকে ছোট প্রতিমা নিয়ে আসেন শান্তদা। সেদিন চিত্রাদি এসে বললেন, "মীরা নেই। তাই এবারে পুজো বন্ধ রাখার কথা বলেছিলাম। কেউ রাজি হলনা। আমারও শরীরমন ভালো নেই। কীকরে কীভাবে পুজো হবে জানিনা। ওরা তো বলেই খালাস।"

কথাটা ভাবার। এখানে পুরুতমশাই মন্ত্র পড়ে পুজো করেন না। পুজো হয় অন্যভাবে। ঠাকুরের সামনে বসে মীরাদি সরস্বতীর বন্দনা পড়ে শোনাতেন। সবাই দেবীর বেদীতে অঞ্জলি ভরে ফুল দিত। প্রসাদ বিতরণের পরে বিভিন্ন বই থেকে পড়ে শোনাতেন হেনাদি, সাহিত্যিক তপনতনু। এবারে কীভাবে কী হবে?

নামকরা গায়িকা বাসন্তী পাইন এই আরশিনগরেই থাকেন। কারো সঙ্গে মেলামেশা করেন না। লাইব্রেরিতে বই আনতে গিয়ে তাকে কখনও-সখনও দেখেছে ঝুমুররা। খুব ভোরে তার বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে তার রেওয়াজ শোনা যায়। ওই সরস্বতী পুজোর দিন তিনি এসে বসেন সবার সঙ্গে। পুজোর শেষে গান গেয়ে শোনান। নায়িকা মণিকুন্তলা, বাসন্তীবালা আসেন। দুপুরে একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খান। খিচুড়ি আলুরদম আর চাটনি, প্রতিবারের মেনু। খিচুড়ি রাঁধেন হেনাদি। ভূষণদা, তুলসী, চিত্রাদি, থাকেন ব্যবস্থাপনায়। এবারে তুলসী কী কিছু করবে? কে জানে?

শান্তদা লাইব্রেরির মিটিং হয়ে যাবার পর ঝুমুরদের ডেকে বলেছেনও, "তোমাদের ওপর এবারে পুজোর অনেক দায়িত্ব পড়বে। মীরাদি নেই। চিত্রাদি এবছর পুজোর কাজে থাকবেন না বলেছেন। তোমরা তো মীরাদিকে সাহায্য করতে। পারবে না, এবারের পুজোটা সামলে দিতে?"

ওরা বলেছিল "চেষ্টা করব।"

শান্তদা শালিনীদি, বলাকাকেও ওদের মত একই কথা বলেছেন। কিন্তু কে কতটা কী করবে, বলা শক্ত! ওরা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে। মীরাদির বাড়িতে যেসব পুজোর থালা ডিস আছে সেগুলো ধুয়ে মুছে রেখেছে।

তুলসীকে বলতেই তুলসী থালাগুলো, পুজোর ঘন্টা, শাঁখ, চন্দনপাত্র, ধূপদানি নিয়ে এসেছিল ওদের বাড়িতে। বলেছে পুজোর সময় সাহায্য করবে।

নবীনাদির নিজের বাড়িতে, স্কুলে সরস্বতী পুজো হয়। তাই কোনবার আসতে পারেননা। এবারে অনেক করে বলেছে ওরা। আসবেন তো বলেছেন। শেষ অবধি কি করবেন কে জানে? সবমিলিয়ে একটা ভাবনাচিন্তার পাহাড় জমেছে ওদের মাথায়। একমাত্র ভরসা ভূষণদা। তবে সেটা ভূষণদাকে বুঝতে দিলে চলবে না। তাহলেই ছেড়ে পালাবে।

ঝুমুর চোখ তুলে দেখে চা সামনে রেখে ভূষণদা চোখবুজে বিড়বিড় করে পুজোর মন্ত্র পড়ছে। মনুয়া ব্যাপারটা আগেই বুঝেছে। তাই ইশারা করে ওকে দেখাচ্ছিল। ঝুমুর হাসে। তাকিয়ে দেখে কুমড়ো ফুলের বড়া ভাজবে বলায় ভূষণদা কাঁচালঙ্কা, নুন দিয়ে বেসম গুলে রেখেছে। ও মনেমনে ভাবে মানুষটা সরল সিধা। তাই এত আনন্দে থাকে। ওদের মত দুঃখের আঘাতে নুইয়ে পড়েনি।

# #

নবীনা স্কুল থেকে বেরিয়েছিল সোজা বাড়ি আসবে বলে। কী খেয়াল হতে মলে ঢুকে পড়ে। আর তখনই ওর নজরে পড়ে শার্টটা। বিদেশ খুব রোগা হয়ে গিয়েছে।তবু এটা ওকে মানাবে মনে হয়। শার্ট কিনে কাউন্টারে বিলের জন্য দাঁড়িয়েছিল ও। হঠাৎ সামনের আয়নায় দেখে রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। মন দিয়ে লক্ষ্য করছে ওকে। তারমানে লোকরঞ্জনের লোক এখনও নজরে নজরে রেখেছে নবীনাকে। হয় ওরা নিশ্চিত যে ঝুমুরের সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ আছে। নয় ওরা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ওর পিছুপিছু ঘুরছে। তবে ঘটনা যাই হোক ওকে সাবধানে থাকতে হবে। একবার ওর পেছন পেছন ওরা যদি আরশিনগরে পৌঁছে যায়, পুলিশ দিয়ে বা যেভাবে হোক ঝুমুরকে টেনে নিয়ে আসবে। সেটা কোনওমতেই হতে দেওয়া যায়না। এমনিতে ঝুমুরের মা মানুষটা খুব নিরীহ প্রকৃতির। স্বামীর বিরুদ্ধে লড়ার মত শক্তি একেবারেই নেই। নাহলে এত কান্ডের পরও ওই লোকটার বাড়িতেই বসে থাকেন? উনি কাঁদছিলেন ওর কাছে।

"আমি জানি আমার মেয়েকে আপনি নিরাপদেই রেখেছেন। তবু একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।"

ও বলেছিল, "ওকে আনলে আর ফেরৎ নিয়ে যেতে পারবনা। রাজি তো?" একেবারেই চুপ করে গিয়েছিলেন উনি। না থামিয়ে উপায় ছিল না। কথা হচ্ছিল স্থানীয় কালী মন্দিরে। চারপাশে লোকরঞ্জনের লোক থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তখন হিতে বিপরীত হতেই পারে। অন্ততঃ সেটা হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়।

শার্টের দোকান থেকে বেরিয়ে একটা স্টেশনারি দোকানে ঢুকল ও। পিসিমনির কিছু ফরমাস আছে। একটু পরেই দেখল ওই লোকটা। ওকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। জিনিসগুলো টুকটাক, হাতে গুছিয়ে নিয়ে ও সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটার। "এই যে আমি। আমাকেই খুঁজছেন তো? চলুন নিয়ে চলুন । কোথায় যেতে হবে?"

লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে ভিড় সরিয়ে দৌড়ল। ও ভাবছিল একবার চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে। তারপর কিছুই না করে একটা টোটো ভাড়া করে বাড়ি ফিরল।

বিদেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিছুদিন হল বাড়ি থেকে ও বেরোচ্ছে দেখলে মুখভার করত। আগে আগে জানতে চাইত। এখন গোঁজ হয়ে বসে থাকে। তবে ওর যা স্বভাব। রাত করে হলেও নবীনার মুখ দেখে তবে ঘুমোতে যাবে। বাড়ি ফিরে নবীনা হাঁক দিল পিসিমনিকে, "একটু চা হবে ফ্লাস্কে?"

"ফ্লাস্কে কেন? আমি করে দিচ্ছি।" পিসিমনি রান্নাঘরে ঢুকে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতেই ও পিসিমনিকে সব বলল। পিসিমনি ভয় পাচ্ছিল শুনতে শুনতে। বিদেশ না হাজির হয়।

পরদিন সকালে ওর ঘরের সামনে এসে ডাকছিল বিদেশ। ও চোখ খুলতেই বলল "সুপ্রভাত। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি আমার ছেলের স্কুল থেকে ঘুরে আসি।"

"যাও। এবারের মতো। যেতে চাইছ যখন। কিন্তু এরপরে আর জানতে চেয়োনা, আমি অনুমতি দিতে পারব না।"

বিদেশ বেরিয়ে যেতেই ওর মনে পড়ল শান্তদাকে একবার ফোন করে বিদেশের ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে কী করলেন জানতে হবে। ওকে না দেখালে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যদি ডাক্তার বলেন ঠিক আছে, বিদেশকে আরশিনগরে দিয়ে আসবে ও। নবীনার কাছে থাকাটা ওর কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেলে পরে ওকে আর ফেরৎ পাঠানো যাবে না। শান্তদা খুব সকালে ওঠেন। ফোন করা যেতেই পারে।

নবীনা ফোন খুলতে খুলতেই দেখল পিসিমনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। "এই ছেলেটাকে এভাবে রাখাটা তোর উচিত হচ্ছে না। গতকাল তোর ফিরতে দেরি হওয়ায় ঘরবার করছিল। আমার কাছে বারবার জানতে চেয়েছে, তোর বাড়ি আসতে অত দেরি হচ্ছে কেন। হঠা ওকে। নাহলে তুইই বিপদে পড়বি।"

পিসিমনির কথার কোনও উত্তর দেয়নি ও। শান্তদার নাম্বারে আঙুল টিপতে টিপতে ভাবছিল, পিসিমনি কোন বিপদের কথা বলল? সেকি মধুর বিপদ?

শান্তদা ফোন ধরেই বললেন, "তোমাকেই করতে যাচ্ছিলাম। বিদেশের খবর কী? কেমন আছে? ওর ডাক্তার ঠিক হয়েছে। ওকে নিয়ে দেখাতে যাব। আরো ভালো কথা, দেবকে আবার নার্সিংহোমে বিদেশকে রাখার কথা বলতে ও রাজি হয়েছে। আমি দু'একদিনের মধ্যেই ওকে নিয়ে আসব কেমন।"

নবীনা ফোন রেখে চুপচাপ বসে রইল। শান্তদার মুখে বিদেশকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাবার কথাটা ওর একদম ভালো লাগেনি। আসলে মানুষের মন বোঝা খুবই শক্ত! যা দেখা যাচ্ছে, ও নিজেই নিজেকে চেনে না। বিদেশ বাড়িতে থাকলে ওর অনেক চাপ হয়। পিসিমনি ঝামেলা শুরু করে। ওকে বিদেশকে দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু ওর চলে যাবার কথা শুনেই মন কেমন তেতো স্বাদে ভরে গেল।

স্কুলের পরিস্থিতিও ভালো নয়। ওকে নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। এমনকি বারবার ওর টিচারদের বদলী হিসাবে স্কুলে থেকে যাওয়া নিয়েও কথা উঠেছে। হেড দিদিমনি ফোনে ওকে সব বলেছেন। ও স্কুলে গেলেই কিছু কিছু দিদিমনি আবার ওর সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা করতে আসেন। তবে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে ওর সঙ্গে সেক্রেটারি বা বড়দির কী কথোপকথন হল সেটাই জানা।

নবীনা ভাবছিল, এইভাবে অশান্তির মধ্যে আর চাকরিতে থাকবে না ও। তার থেকে বাড়িতে প্রাইভেটে ছাত্রী পড়াবে। ইংরাজীর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে নিচু ক্লাসের মেয়েদের পড়ালে বাংলার চর্চাও হয়ে যাবে।

আজ শুক্রবার। ওর অফ ডে। সকালে স্কুল যাওয়ার তাড়া নেই। কেমন একটা আলসেমী লাগছে, একটু গড়িয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আসলে বিদেশের চলে যাওয়ার প্রস্তাব, স্কুলের শুরু হওয়া গোলমাল, সব মিলিয়ে কাহিল করে দিয়েছে ওকে। দিনের আলো ফট্‌ফট্ করছে, এসময় আবার শুয়ে পড়াটা ঠিক হচ্ছে না ভেবেও নিজের বিছানায় গড়িয়ে পড়ল ও। কপালে হাতচাপা দিয়ে শান্ত মনে নিজের মাথায় আসা এলোমেলো ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল নবীনা। হঠাৎ কার আঙুলের ছোঁওয়া পেল মাথার চুলে। ওর মাথায় আর কে হাত বোলাবে পিসিমনি ছাড়া?

চোখ খুলতেই চমকে গেল। খাটের একপাশের সরু জায়গায় চেপেচুপে বসেছে বিদেশ। নবীনার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুলে হাত বোলাচ্ছে। সর্বনাশ! এই দৃশ্য পিসিমনি দেখলে মন্দকথা শোনার আর কিছু বাকি থাকবে না।

তড়াং করে উঠে পড়ল ও। বিদেশ খুব একটা অবাক হল বলে মনে হলনা। ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল ছেলেটা। "টয়লেট থেকে আসছি, তুমি বোসো। কথা আছে।"

"আমারও কথা আছে। তাড়াতাড়ি এসো।"

কোন ভনিতা না করেই কথা শুরু করে নবীনা। "তোমাকে শান্তদা নিয়ে যাবেন দেবের নার্সিংহোমে। এবারে আর পালিয়ো না। ঠিকমত চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হতে হবে তো।"

কথাটা বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ও। কে জানে কেন বিদেশের চলে যাবার কথায় যুক্তিহীন ভাবে চোখে জল আসছে। বিদেশ কোন উত্তর দেয়না। ও স্কুলের না দেখা খাতাগুলো নিয়ে খাটে গুছিয়ে বসে।

"তোমার কথাটা কী? বললে না তো।"

"আমি তোমাদের ছেড়ে কাল একেবারেই চলে যাচ্ছি নবীনা। আজ ছেলের সঙ্গে কথা বলা, একটু ভালো করে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে ওর কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিলাম। ও আমাকে দেখতে পেয়ে দুহাত বাড়িয়ে দৌড়ে এলো। খুব কাঁদছিল জানো। আমাকে ছাড়তেই চাইছিল না। কোনরকমে হাত ছাড়িয়ে বুঝিয়ে চলে এসেছি।"

"আর তোমার বউ? সে কী বলল?"

"সে প্রথমে হই হই করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। খুব মিহিগলায় বলল, "আসছ তো? আমরা অপেক্ষায় থাকব কিন্তু।" তাই ভাবছি পুরনো রাগ পুষে রাখা মানে নিজেকে কষ্ট দেওয়া, ছেলেটাকে কষ্ট দেওয়া। তাই কাল একেবারেই বাড়িতেই চলে যাব ভেবেছি। তোমাকে না বলে তো যাওয়া যাবে না। তাই ফিরে এলাম। কাল যাব কাল।"

নবীনা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিদেশের মুখের দিকে। এ তো দিব্যি স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে। তাহলে শান্তদা কেন বললেন যে দেব বলেছেন ওকে মনের চিকিৎসা করাতে হবে। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে। কথাগুলো বলার সময় বিদেশকে খুব আনমনা লাগছিল। সেটার কারণই বা কী? যাকগে ওর যা ভাল লাগে তাই করুক। নবীনা চুপচাপ থাকবে। তবে বিষয়টা একবার শান্তদাকে জানানো দরকার। এভাবে চলে গেলে শান্তদা ওকে কিছু বলতে পারেন। তার থেকে ও যা শুনল রিপোর্ট করে দেবে। উনি তেমন বুঝলে বিদেশের সঙ্গে কথা বলবেন।

কথাগুলো বলার পর বিদেশ বেশ কিছুক্ষণ হল ঘরে চলে গিয়েছে। খাতা দেখতে দেখতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ও। খাতাগুলো গুটিয়ে রেখে দিল। মেয়েরা অনেক কষ্ট করে পড়ে,পরীক্ষা দেয়। অর্ধেক মন নিয়ে ওদের খাতা দেখা কখনও উচিত নয়। মোবাইল বার করে শান্তদাকে ফোন করল। বিদেশের নতুন খবর দিতে শান্তদা কেমন থম মেরে গেলেন। তারপর বললেন, "মিনিট দশেক বাদে তুমি, তোমাদের বড় রাস্তার মোড়টায় আসতে পারবে? ওখানেই অপেক্ষা করো। আমি গাড়ি নিয়ে এসে তোমাকে তুলে নেব। খুব জরুরি দরকার, কথা বলার আছে। আর হ্যাঁ, তোমার এই আসাটা কেউ যেন বুঝতে না পারে। আসছ কি?"

নবীনা সম্মোহিতের মত বলে, "ঠিক আছে।" কলটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায়।

শ্যামবাজারের মোড়ের এই খাবারের দোকানটায় এর আগেও শান্তদার সঙ্গে এসেছে ও। এদের বিশেষ খাবার হল বড় বড় কপির সিঙারা, ঘীয়ে ভাজা। খুব ভালো অমৃতিও পাওয়া যায়। দোকানের ঠিক পাশেই একটা চালা আছে। সেখানে চা বানানো হয়। স্পেশাল দুধ চা তৈরি করে এরা। এখানে এলে ওরা লিকার চা খায়না। প্লেটে দুটো সিঙারা, দুটো অমৃতি, আর চায়ের দুটো কাপ সামনে নিয়ে চুপ করে বসে আছে দুজনে। চা বোধহয় ঠান্ডা হয়ে গেল।

শান্তদা একটু আগেই ভারি অদ্ভুত কথা বলেছেন। শান্তদা বললেন, "এত সমস্যা, এর মধ্যে আবার বিদেশেরটা যোগ হল। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। তুমি ওর ব্যাপারে সবটা জানো না। আমি তো জানি। আসলে হেনাদির মাধ্যমেই ও আরশিনগরে আসে। ওর বউ অনেকদিন আগেই ছেলেকে নিয়ে ব্রিটেনে চলে গিয়েছে। সে ঘটনা ঘটেছে ওর চোখের সামনে। সে বউ এখন ওখানে চাকরি করে। এখানে আসার কোন কথা শুনিনি তো। তাছাড়া ও যাবে কোথায়? ওর বাড়ি তো ও নিজেই বিক্রি করে দিয়েছে।"

নবীনার দিকে এবার তাকান শান্তদা, "খেয়ে নাও। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

নবীনা মুঠো খোলে, হাত বাড়ায়। ওর কেমন আতঙ্ক হচ্ছিল। এদু'দিন ছেলের কাছে বলে বিদেশ কোথায় গিয়েছিল?

"ডিপ্রেশান। ঘোরতর ডিপ্রেশান। ও আসলে ছেলে বউকে খুবই ভালবাসত। তারা যে ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, সেটা ও মানতে পারছে না। ওদের ডিভোর্স হয়েছে ...।"

শান্তদার অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে নবীনা, "কিন্তু ও যে আমায় বলল ওদের ডিভোর্স হয়নি।"

"এরপরেও এসব বলছ? ও যা যা বলছে বা বলেছে সব ভুল। সেটা বুঝতে পারছ না? চল,তোমায় নামিয়ে দিয়ে একবার দেবের সঙ্গে কথা বলতে যেতে হবে। বিদেশের রোগটা বেড়েছে মনে হচ্ছে। ও হ্যাঁ, তোমাকে দু'একদিন, মানে যতদিন না বিদেশকে আমি নিয়ে যেতে পারি, ওর ওপর একটু নজর রাখতে হবে। ঘরের সঙ্গে বাথরুম থাকলে রাতে দরজায় বাইরে থেকে তালা দিতে পারো। নাহলে তোমাদের বাড়ির বাইরের দরজার চাবি ওর নাগালের বাইরে রেখো। আর ও যেন বুঝতে না পারে যে তুমি সব জেনে গিয়েছ। আর বড় জোর একদিন, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর ব্যবস্থা করছি।"

মোড় থেকে ফেরার পথেই ব্যাগে রাখা পিসিমনির প্রেসক্রিপসান দেখিয়ে ঘুমের ওষুধ কিনে নিল নবীনা। বিদেশকে দিতে হবে। নাহলে রাতে পালায় যদি। আজ রাতে ওকেও খেতে হবে। নাহলে ঘুম আসবেনা। অন্যের সামনে অভিনয় করা যায়। নিজের সঙ্গে তো আর সেটা চলেনা।

# #

ভোরে আবার ভূষণ গিয়েছিল। গিয়ে দেখে জঙ্গল একেবারেই ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। তাঁবুগুলো ভ্যানিস্। কোথাও কোনও চিহ্ন না রেখে গেল কোথায় ওরা? ভূষণ আসলে এই জঙ্গলে দরকারি কাজ সারতে এসেছে। এই জঙ্গলে একটা কুল গাছ আছে। সেটাতে বেশ ভালো কুল হয়। তাছাড়া নারকেলের দু'একটা গাছ আছে। তাতেও বেশ ভালোই নারকেল হয়। ঝুমুরের শখ হয়েছে সরস্বতী ঠাকুরের জন্য নাড়ু বানাবে। তাই ভূষণ এসেছে নারকেল পাড়তে।

ভূষণ নারকেল গাছের প্রায় মাথার কাছাকাছি উঠে চারপাশটা তাকিয়ে দেখছিল। এই বিদ্যে ওর অনেক দিনের। ছোটতে বাড়ির নারকেল গাছে উঠে বসে থাকত। তখন দেখেছিল নারকেল গাছের একেবারে মাথায়, উঁচুতে, পাখিরা বাসা বাঁধে, আর সেখানে ভামেরা ওঠে পাখির ছানা খাবে বলে। ও ভাবছিল এখানে পাখিরা বাসা বাঁধেনি কেন? একটু পরেই মনে হল এই জঙ্গলে বাসা বাঁধার জন্য কত গাছ আছে তো। ওপর থেকে আবার নজর চালাল ও। না ওই জলপাই রঙের পোশাক পরা মানুষদের কোনও অস্তিত্বই এখন জঙ্গলে নেই।

নারকেল, কুল, পেয়ারা, সব নিয়ে ফিরল ভূষণ। শীতকালের আপেল, কমলালেবু তো আর বনে পাওয়া যাবেনা। তাছাড়া পুজোয় আর যা যা লাগে, সবকিছুই শান্ত শহর থেকে নিয়ে আসবে। একটা লিস্ট করা আছে। সেই অনুযায়ী ঠাকুরের সবকিছু আসে। কিন্তু পুজো হয় এখানকার মতো। ওই ব্যাপারটা ভূষণের হজম হয়না। পুরুত এলোনা, ঘন্টা বাজল না। কিসের পুজো?

ঝুমুর লিস্ট নিয়ে ঝুড়িতে সব গুছিয়ে রাখছিল। মনুয়া বলল, "যা মনে হচ্ছে এবারে পুজোয় নবীনাদি আসতে পারবে না।"

ঝুমুর বিরক্তি না লুকিয়ে বলে, "তোর যত বাজে কথা। আমাকে দিদি বলেছে, এবারে আসার খুব চেষ্টা করবে। বাড়িতে পুজো সেরেই ট্রেনে উাবে। ঠাকুরের পুজো মিটলে দু'একদিন কাটিয়ে যাবে।"

মোটামুটি ভাবে পুজোর কাজ চালানোর মত কাঠ এনে জড়ো করে দিয়েছে শালু। বলাকা, রিমঝিম, শালিনী সবাইকেই কাজে লাগতে বলেছিলেন শান্তদা। তারমধ্যে রিমঝিম বারদুয়েক এসেছে। শালিনী একদম না। ও রিমঝিমকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, ওর শরীর ভালো নেই। পুজোর কাজ এখন কিছু করতে পারছে না।

তুলসী এসে জানাল, হেনাদির জ্বর এসেছে। ঠিক পুজোর সময়েই আসবে, এসে পুজো করবে। এবারে খিচুড়ি হচ্ছে না। কাজেই সে সংক্রান্ত কোন কাজকর্ম নেই।

ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে চিত্রাদির দেওয়া স্থায়ী আলপনার পাশে এবারে লাবণি আলপনা দিল। শঙ্খ লতার কল্কা দিয়ে একদম অন্য ঢঙের আলপনা। সবার খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ ভাল ঠাকুর গড়েছে ও। চোখের দৃষ্টি ভারী প্রসন্ন। হাতে বরাভয় মুদ্রা। বাসন্তী রঙের কাপড় পরা ঠাকুরকে অঞ্জলি দিতে যাওয়া বাচ্চা মেয়েদের মত দেখাচ্ছে। শান্তদা বললেন, "চমৎকার ঠাকুর হয়েছে।"

পুজোর কয়েকদিন আগে রাত ঠিক দশটা নাগাদ একটা ঝঞ্ঝাট হল ঝুমুরদের বাড়িতে। কড়াটা কেউ নাড়ছিল। সঙ্গে চাপা গলার ডাক, দরজাটা একবার খোল, আমাকে ঢুকিয়ে নাও। আমি বিপদে পড়েছি। ঝুমুর, ভূষণের পাশে শিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনুয়া এগিয়ে গেল। ওর একহাতে বঁটি, অন্যহাতে দরজা খুলল ও। মেয়েটার প্যাঁকাটির মত চেহারা, কিন্তু তেজ আছে। দরজা খুলে ওরা হতবাক। সেই আহত ছেলেটা, ভিজে জামাকাপড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

ঝুমুর পা ধোবার জল দিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইল যেন। মনুয়া ভাগ্যিস্ একদৌড়ে শুকনো জামা কাপড় এনে দিয়েছিল। তাই কাঁপুনি বন্ধ হল।

সেদিন আর এদিনের বৃত্তান্ত একই। ওকে ওর দলের লোকগুলোই তাড়া করেছিল। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে শান্তদা ওকে তোলে বন্ধুর সেই নার্সিংহোমে। সুস্থ হবার পর ওকে ছেড়ে দেয় ওরা। ওর বাড়ি আসলে শিলিগুড়িতে, সেখানে ও যায়নি। কেননা অনেকদিনই বাড়িছাড়া। ওখানে গেলে খবরটা ওই দলের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। তাই এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। শান্তদা ওকে কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। সেসব ফুরিয়ে যেতে ও শান্তদার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য গা ঢাকা দিয়ে এদিকে আসছিল। জঙ্গলের পথে ওর সেই পুরনো বন্ধুদের নজরে পড়ায় ও নদীতে ডুবসাঁতার দিয়ে এখানে এসেছে।

ভুষণদা বলে, "এসেছ ঠিক করেছ। শান্ত তোমাকে কিছু কাজও জুটিয়ে দিতে পারবে হয়ত। কিন্তু ওই লোকগুলো তো তোমার খোঁজে এখানে ঘুরে গিয়েছে। ওরা আবার এলে তুমি বাঁচবে না। তার থেকে চল, এখন মীরার বাড়ি ফাঁকা। বাইরে থেকে দরজায় হাঁসকল দেওয়া আছে। ওখানেই তোমাকে রেখে আসি। ওই বাড়ির পেছনের ইঁদারার জল তুমি ব্যবহার করো। আমরা খাবার জল তোমাকে দিয়ে আসব। কিছু খেয়ে নিয়ে এখনই চল। সকালে কারুর না কারুর নজরে পড়ে যাবে।"

নিজেদের ভাগ থেকে রুটি তরকারি ওকে বেড়ে দিল ঝুমুর। ওর খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল আরেকটু দিলেও খাবে। কিন্ত মনুয়া ইসারা করে বারণ করল ঝুমুরকে। ঝুমুর বুঝেছে কারণটা। অনেকদিনের না খাওয়া পেটে কতটা সহ্য হবে তো জানা নেই।

ভুষণদা জানতে চাইল, "ওরা কারা? ওই জলপাই রঙের পোশাক পরে থাকে কেন?"

ছেলেটা বলে, "ওদের কথা কিছু বলবনা বলেই আমি বোবা সেজে ছিলাম। আজও বলছি না। আমার কথা বলি। আমার নাম শমীক। পড়াশুনা করতে ভালবাসতাম। হায়ারসেকেণ্ডারী পরীক্ষার পর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াকালীন এদের দলের কিছু ছেলের পাল্লায় পড়ি। তারপরের পরিণতি এই তো দেখছেন। দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন আর দেখতে পারছি না। পালাতে গিয়েছিলাম নিজের উদ্ধারের আশায়। গুলি খেলাম তখনই। ওরা ভেবেছিল আমি মরে গেছি। পরে কোনভাবেই দেহ খুঁজে না পেয়ে এখানে হুজ্জুতি করেছে হয়ত। যাকগে, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কোথায় রেখে আসবেন চলুন। এখানে থাকা সত্যিই ঠিক হবেনা। ওরা এলে দয়া মায়া না করে মেরে দেবে আমাকে।"

রাতটা বেশ ভয়ে ভয়ে কাটাল ওরা। তারা যদি আসে আবার! ভূষণদাও নেই। শমীকের সঙ্গেই রাতটা কাটিয়ে সকালে আসবে বলে গিয়েছে। নতুন জায়গায় নাহলে খুবই অসুবিধা হবে ছেলেটার।

সকাল হতে না হতে ভূষণদা হাজির। চা খেয়ে একগাল হেসে বলল, "পেছনের একটা রাস্তা বার করেছি। জঙ্গল দিয়ে বেশ মীরার বাড়ির পেছনে চলে যাওয়া যায়। ওকে খাবার দিতে কোন অসুবিধা হবেনা। আপাততঃ আমার হাতে তুলে দিলে, বেচারাকে স্টিলের গ্লাসে চা আর দুটো নেড়ো বিস্কুট দিয়ে আসি। তারপর দেখছি মীরার বাড়িতে ট্রে, টিফিন কৌটো পাই যদি নিয়ে আসব। তোদের একজন গেস্ট এসেছে। যত্ন আত্তি তো করতে হবে।"

মনুয়া মুখ বেঁকায়, "হুঁ, গেস্টের যা ছিরি। শান্তদা এলে বাঁচি।" সমানে গজগজ করছে ও, "কেনরে বাবা, আর কোথাও জায়গা জুটল না। এখানেই যত হুজ্জুতি। এখন রাঁধো , বাড়ো , খাবার পাঠাও।"

ঝুমুরের খারাপ লাগে। আহারে, খেতে পায়নি কতদিন। তাছাড়া ও যা খাবার খাবে সবই তো আরশিনগরের বরাদ্দ থেকে। ভূষণদা সাতসকালে গামছা করে নদী থেকে কুঁচো মাছ ধরে এনেছে, আলুপিঁয়াজ দিয়ে বেশ গরগরে করে রাঁধবে মনুয়া। আর মুরগীর ঘর থেকে সকালেই চারটে ডিম পাওয়া গিয়েছে, তার কারি বানাবে। তিনজনের জন্য তো করতেই হত। আর একজন বেশি খেলে এত রাগের কী আছে? ছেলেটা জলে ভিজে চান করে যে এখানেই এল, সেকি এমনি এমনি? ওদের বিশ্বাস করেছে বলেই না? এত বোকা, ওই নার্সিংহোমে গিয়েই তো শান্তদার খবর নিলে পারত। ওদের সঙ্গে তো শান্তদার যোগাযোগ আছে। এখানে ঝুঁকি নিয়ে এল কেন? তারপরেই ওর নিজের কথা ভেবে হাসি পায়। ওই কী কম বোকা! সেই তখন থেকে ওই ছেলেটার কথা ভাবছে। বিপদ কী ওরই কম?

ও চুপ করে নিজের কাজ করে যায়। মনুয়াকে ঘাঁটায় না। অনেক কথা শুনতে হবে তাহলে। বিকেলে একবার ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে যেতে হবে। হেনাদির জ্বর সেরেছে। সরস্বতী পুজোর কাজের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে উনি মিটিং ডেকেছেন। ঠিক সাড়ে চারটেয় মিটিং। সময়মত যাওয়ার একটা প্রস্তুতি আছে।

আলু কুটতে কুটতে ও শমীকের মুখটা আবার ভাবছিল। বেচারি ছেলেটা! কী বিপাকেই না পড়েছে। একেবারে শাঁখের করাত। যেতে কাটে আসতে কাটে। আলুগুলো সমান করে টুকরো করতে করতে ওর মার মুখ মনে পড়ছিল। বাড়িতে যখনই কোন রান্নাঘরের কাজ করতে গিয়েছে, মা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে করে দিয়েছে। এবাড়িতে তো রান্নার লোক ছিল। তবু মা নিজেও কখনও-সখনও খুন্তি নাড়ত। বলত, "সব অভ্যেসই রাখা ভাল বুঝলি! কোনটা কখন কাজে লাগে কে বলতে পারে।"

ওকে একদম কোনকাজে হাত দিতে দিত না। কিন্তু মাঝেসাঝে বলত, "একটু চা করে খাওয়া দেখি। ভাল চা করলেই বুঝব ভাল রান্নাও করতে পারবি। সংসার হলে তো রাঁধতেই হবে। এখন আর হাতে হলুদ লাগাতে হবেনা।"

হাসি পায় ওর।কতটাই ভুল ভাবত মা। এখন তো ওকে সব করতে হচ্ছে। বিয়ে তো দূরের কথা ঠিক ভাবে বাঁচতে পারবে কিনা জানা নেই। সামনের দিনের কোন চিন্তাই করতে পারছে না। মনুয়ার সঙ্গে থাকা, তাই সব ভুলে হা হা হি হি করে দিন কাটে। শান্তদা আছেন তাই খাওয়া পরার চিন্তা নেই। কিন্তু ওরা যদি আসে? ওকে টেনে নিয়ে যায়, কী হবে তখন? লোকরঞ্জন কে কোনও বিশ্বাস নেই। ও পাক্কা শয়তান। সহজে হার মানবে না।

মনুয়া বলে এক আর করে এক। সাদা তেলের কৌটো ঝেড়েঝুরে যেটুকু সাদা তেল বেরিয়েছে তাই দিয়ে মোট ছটা লাল আটার পরোটা বানাল ও। কালো জিরে দেওয়া সরু আলুভাজা আর পরোটা থালায় সাজিয়ে মেয়েটা ডাকছিল ভূষণদাকে। "ও ভুষণদা, তোমার আর তোমার গেস্টের পরোটা নিয়ে যাও।" ভূষণদা ঘরের মধ্যে কী খুট্‌খুট্ করছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে পরোটার থালা নিয়ে রওয়ানা দেয়।

নিজেদের জন্য রাখা পরোটার ঢাকা সরিয়ে মজা করে চেঁচায় ঝুমুর, "কিরে তোর আর আমার মোটে দুটো? একটাতে পেট ভরে?"

মনুয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়, "কী করি বল, জামাইবাবুকে তো একটা পরোটা দেওয়া যায়না। শ্বশুরবাড়ির আদর বলে কথা!"

ওকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে ওর নিজস্ব ফিচলে হাসিটা হেসে বলে, "হাঁ করে দেখছিস কী, আমার তো এখন একটাই দিদি। ঝুমুর দিদি।"

ঝুমুর এতক্ষণে কথার মানেটা বুঝতে পেরে রুটি বেলার বেলুনটা হাতে নিয়ে তাড়া করে মনুয়াকে।

মনুয়া ততক্ষণে একছুটে দরজা পেরিয়ে গিয়ে বলছে, "কেন,পছন্দ নয়? বেড়ে দেখতে কিন্তু। এখানে থাকার সময় তোকে হাঁ করে দেখত, আবার দ্যাখ ফিরেও এল। গতিক সুবিধের নয়! এখন বেড়ালের বাঘ হওয়া আটকায় কে? সাবধানে থাকিস।"

# #

ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা **সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় "দিবারাত্রির কাব্য" পত্রিকায়। ২০০১ সালে "দেশ" পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

তপনজ্যোতি মিত্র

এক মেঘপুরুষের জীবন

একাকী মেঘটি ডানা মেলে উড়ছিল আকাশে আর আকুল খুঁজছিল

সে খুঁজছিল তার প্রেমিকা আর এক মেঘকে

এক দেশ থেকে আর এক দেশে
এক গহন থেকে আর এক গহনে
এক দিগন্তের মাঠ থেকে আর এক দিগন্তের দিকে
উড়ে যাচ্ছিল সেই মেঘ

কিন্তু সে পায়নি তার মেঘমানসীকে

তখন বিষাদমগ্নতায় আর হাহাকারের গাঢ়তম বেদনায় ঝরে যাচ্ছিল তার ডানা

সেই পালকগুলো কান্না হয়ে নেমে আসছিল
পৃথিবীর শস্য ক্ষেতে, নদীতে, সমুদ্রে, অরণ্যে

তারপর কখন মিলিয়ে গেল সেই মেঘপুরুষ

কিন্তু শস্যক্ষেত্র ফসলে ভরে উঠল
নদীর শুদ্ধতায় স্নান করল মানুষেরা
দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র তার কূল উপকূলের সঙ্গে ঢেউয়ে ঢেউয়ে খেলা করল
বনভূমি ভরে উঠল গাছেদের অনন্ত সৌন্দর্যে

মেঘ কি জানল তার হাহাকার আর বিষাদকণা
মায়াবী পৃথিবীকে করে তুলেছে তার রূপসী প্রেমিকা ?

মেঘ কি জানল ?

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

পারিজাত ব্যানার্জী

যুদ্ধ শেষের সন্তান

শুনেছিলাম এদেশে একদিন এক ভয়ানক যুদ্ধ বেঁধেছিল।
কত লোক, কত মন্ত্রী সান্ত্রী হেলায় নাকি প্রাণও হারিয়েছিল।

তার মধ্যেই নিশ্চয়ই বেঁচেছিল তবু ভালোবাসার কোনো ঘ্রাণ –
আমি সেই ধ্বংস সময়ের প্রতীকী – আমি সেই প্রেম উপত্যকার জয়গান!

হাতে হাতে শুধু গোলাপ ঘোরে আজ মৃতবৎ পাষাণ শহরে –
বিকৃতি সব নিজেরাই ঢাকি সস্তার লাল চাদরে।

শীত পেরিয়ে আসে বসন্ত, আসে প্রেম উদযাপনের দিন –
প্রেমিকার চোখে আঁধার ঘনায়, নিশ্বাস আজও বিষাক্ত অনলে লীন!

প্রেমের কপট অভিমান

এতদিনে বুঝি সময় হল আসার, দূষিত কণাদের ঘটল ভারমুক্তি –
তাই পথ ভূল করে এই পাণে চাইলে আবার, বললে, যুদ্ধ চাওনা – চাও নিশ্চিন্ত দু মুঠো শুধু শান্তি!

মধ্যিখানে কিন্তু হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, জানো –
আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই কোথাও – মানবতাও অবয়বহীন, জরাজীর্ণ!

ঘুম ভেঙে উঠি নতুন যুগের ছোঁয়ায় –
অলস কপট অভিমানে তবুও প্রেম – দিব্যি মুখ লোকায় কোনো চোস্ত মেহফুজ দোহায়!

এবার খালি একদিন, শুধু একদিন চাই প্রিয় –
যেদিন তোমার চোখের উথলিত প্রেমগাথা – বারুদ গন্ধে হবেনা কোনোভাবেই আর হেয়!

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

ধারাবাহিক

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১৬

নদীর বয়ে যাওয়া জলটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীল। এক দৃষ্টিতে অথবা কোনও নির্দিষ্ট দৃষ্টিতেই নয়। নদীর ওপারটায় কোন বরাবর দিনের সব বেচাকেনা শেষে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করেছে সূর্য। একটা গাঢ় কমলা বৃত্তাকার পিত্তের মতো লাগছে সূর্যটাকে এখন। আজকের মতো তার দাপট অস্তমিত। যেন খুব আলতো করে ঝুলে আছে এই মুহূর্তে আকাশের গায়ে। যে কোনও মুহূর্তেই গাছের শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়বে নদীর ঐ পিছন দিকটায়। নদীর জল এই সময়ে বড় শান্ত। কমলা, আর কালচে নীলে মাখামাখি হয়ে খুব আস্তে আস্তে বয়ে যাচ্ছে পাহাড় থেকে নেমে আসা জল। জলের দিকে তাকিয়ে নীল ভাবল, আচ্ছা এই যে জল বিন্দুগুলো এই মুহূর্তে রয়ে গেল, বয়ে যাচ্ছে বা বয়ে যেতে চলেছে তার চোখের সামনে দিয়ে, এরা কারা ? বর্তমান অবস্থানে তো জন্ম নয় এদের। এখন ভাটা চলছে, কচুরিপানা, খড়ের কাঠামো বুকে করে জলবিন্দুগুলো বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু একটু আগে তো নিশ্চয় জোয়ার ছিলো। তারমানে সমুদ্র থেকে ভেসে আসা কিছু জল হয়তো কয়েক ঘন্টা আগে এসেছিলো এই নির্দিষ্ট অবস্থানে। আবার ওদিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে বা তার কিছু আগে পরে উত্তর দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী নেমে এসেছিলো বরফগলা জল অনেকটা পথ পার করে। সমুদ্র থেকে উঠে আসা জল আর পাহাড় থেকে নেমে আসা জল আজ দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছুঁয়ে গেছে নীল নদীর যে অংশটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেই অংশটিকে। তাহলে বর্তমানে সেই নির্দিষ্ট অংশ বা অবস্থানে বিচরণ করছে যে জলবিন্দুরা, তার কারা ? পাহাড়ের না সাগরের ? তাদের তো না আছে হিমশীতল কোনও অনুভূতি না আছে লবণাক্ত স্বাদ। তবে তাদের চরিত্র কি ? তবে কি ঘটনার ঘূর্ণিপাকে এই জলবিন্দুরা আর কারওই নয় ? নতুন কোন ও চরিত্র অর্জন করেছে এরা ? নতুন ভাবে বাঁচতে শিখেছে ? নতুন করে আহরণ করেছে কোনও শাশ্বত জীবনদর্শন, ঠিক নীলেরই মতো ? আজকাল নিজের নিজে তাকালে নীল অবাক হয়ে যায়। শেষ কিছুদিনে কত বদলে গেল তার জীবন। বদল না কি পুনর্জন্ম, resurrection যিশুর মতো ? সব মানুষের জীবনেই একটা চাওয়া থাকে, যে চাওয়া তার নিজস্ব চাওয়া। সে চাওয়া মানুষের এতটাই নিজস্ব যে পৃথিবীর হাটে তার উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া মুশকিল, বেশীরভাগ সময়েই মানুষকে বিকিকিনি ছাড়াই ঝাঁপ ফেলে দিতে হয় সে দোকানের। খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এটা ঘটে যে ঝাঁপ ফেলে দেওয়ার পরে ও আসে কোনও মানুষ, কোনও অচেনা বা অনেকদিন আগে এ' পথে হেঁটে যাওয়া পথিক, কড়া নাড়ে দোকানের দরজায়, বলে, ''কই গো দোকানি, ঝাঁপ বন্ধ কেন ? আমি যে অনেক দূর থেকে এসেছি তোমারটা নিতে''। সে সব রাতে হঠাৎ দোকানির দোকানের চারপাশটায় আলোয় আলো হয়ে যায়। দীপ্ত হাতে আবার ঝাঁপ তোলে দোকানি। শুরু হয় এক অনন্ত বেচাকেনা, সে'সব রাত বড় নিজস্ব রকমের জরুরী রাত, বিশেষ রাত, সে'সব রাত থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় এক অন্যরকম সওদায়।

আজ নীলের জীবনেও এমনই এল সওদা চলেছে। শ্রী এসেছে তার জীবনে। আজ আর সে সমুদ্র থেকে উঠে আসা জলের মতো শুধু সোমদত্ত সেন নয়, আজ আর সে পাহাড় থেকে নেমে আসা আনকোরা আঠারোর নীল সেন ও নয়, আজ সে এক নতুন মানুষ, আঠারোর নীলের শুদ্ধতা ও বিয়াল্লিশের সোমদত্তর অভিজ্ঞতা মিলে জন্ম দিয়েছে এক নতুন জীবনবোধের, এক নতুন চেতনার, অনুভূতির। শ্রী তার জীবনে নতুন করে ফিরে এসে গড়ে দিয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর এক পথ, যে পথে এখন নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে যেতে পারে নীলের বোধ, আর অনুভূতির দল। শ্রী তার জীবনে রচনা করে দিয়েছে এক অন্যরকম আকাশ, যে আকাশে যখন-তখন ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে নীলের সৃষ্টির ঝাঁক। মেঘলা দুপুর, গোধূলির মায়া, ভোরের স্নিগ্ধতা, বৃষ্টির গন্ধ, মাটির ডাক — সব কিছুই যেন নতুন সাজে সেজে এসে দাঁড়ায় নতুন নীলের চোখের সামনে। জাগতিকতা, পার্থিব জটিলতা, নিত্যদিনের অঙ্কের কচকচি ঘোরাফেরা করতে থাকে নীলের চারপাশে, আর নীল যেন তারই মধ্যে পরমহংসের মতো ভেসে-ভেসে চলে যায় অন্য এক পৃথিবীতে যে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, — সব কিছুই বড়

আলাদা, একদম অন্যরকম। আজকের সোমদত্ত সেন তাই এক তুড়িতে অফিসের সমস্ত ব্যস্ততা উড়িয়ে দিয়ে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াতে পারে কমলা রঙা নদীর ধারে, এক নিমিষে আজকের সোমদত্ত সেন হয়ে উঠতে পারে শ্রী-র নীল, শুধু মনের দিকে এক পা ফেললেই। (আজ একটু পরেই সে যাবে জয়িতাকে দেখতে,) স্কুল ফেরতা ওখানে পৌঁছলো পাপানকে নিয়ে ফিরবে বাড়ি। একটু পরেই আবার সোমদত্ত সেন হয়ে সে হেঁটে যাবে অফিসের সিঁড়িগুলোর দিকে, ব্রিফকেস আর ল্যাপটপ হাতে উঠে বসবে দামী গাড়িতে, কিন্তু এই যে মাঝের সময়টায় একদম নিজস্ব একটা সময় বেঁচে যাওয়া, এই যে মাঝের সময়টায় বাকি সব কিছু অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে নীল হয়ে ওঠা, এটাই এখন নীলের জীবনকে পৌঁছে দেয় কোনও বৃহত্তর ক্যানভাসে, জীবনকে দেখবার আর বোঝবার দৃষ্টিটাকে করে দেয় অনেক বড়। বাড়িতে দেয় পেরিফেরিয়াল ভিশনটাকে, মাটির পৃথিবীতে থেকেও যেন বিরাজ করতে শেখায় একটু উচ্চতায় যেখান থেকে আদিগন্ত দেখা যায় জীবনটাকে, জীবনের বাইরে বা ভিতরে যে আরেকটা জীবন ছড়িয়ে আছে, তার একটা প্যানোরোমিক ভিউ পাওয়া যায়। এটাই এখন নীলের বেঁচে থাকবার রসদ, এতেই এখন নীলের জীবনযাপনের সার্থকতা।

নীল বাড়িটার সামনে মেরুন অল্টোটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হল এ' গাড়ি চেনে সে, ডঃ চক্রবর্ত্তীর। তাহলে কি জয়িতা আবার . . . ? দ্রুত পায়ে ভেজানো দরজা দিয়ে ঢুকে জয়িতার ঘরে পৌঁছে একটু থমকে গেল নীল। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে জয়িতা, পিঠের দিকে দুটো বালিশ গুঁজে দেওয়া হয়েছে। দেখে বোঝাই যাচ্ছে, প্রচন্ড হাঁফাচ্ছে, কথা বলবার শক্তিটাও নেই তেমন এই মুহূর্তে। নীলকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করল শুধু, কিন্তু আরেক দফা কাশির দমকে সে চেষ্টা ভেসে গেল। পাপান এরি মধ্যে পৌঁছে গেছে, খাটের একপাশে চুপ করে বসে আছে। ডঃ চক্রবর্ত্তী লেটার হেডে একগাদা কি সব লিখে চলেছেন। জয়িতার মা এবার দেখতে পেয়েছেন নীলকে, পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন, ''সকাল থেকেই হাঁফটা খুব বেড়েছে, সঙ্গে আবার কেমন যেন ঘুসঘুসে জ্বর। জ্বরটা কালকের থেকেই . . . । তুমি আসবে জেনেই আর আগে খবর দিইনি।''

এতক্ষণে ডঃ চক্রবর্ত্তী নীলকে খেয়াল করতে পেরেছেন। এক ঝলক হাসলেন, ''গুড্ ইভিনিং মিঃ সেন। ওনার হাঁফটা তো আবার খুব বেড়ে গেছে দেখছি। ডেকাড্রন, ডেরিফাইলিন পুশ করে দিলাম স্প্যাজমটা দেখে। কোর্সটা চলুক।''

— ''এই দফায় যেন বড় তাড়াতাড়ি recur করল ডঃ চক্রবর্ত্তী'', নীলের গলায় উদ্বেগ আর প্রাণ মিশে গেল।

— ''হ্যাঁ, সেটাই তো বুঝতে পারছিনা। উনি তো নিয়ম কানুনের মধ্যেই আছেন, তবু যে কেন . . . । আবার সঙ্গে এই জ্বরটা . . . মিঃ সেন, কতকগুলো ব্লাড টেস্ট লিখে দিলাম। ভালো কোথাও থেকে করিয়ে নেবেন যত তাড়াতাড়ি পারেন। মিসেস সেন-এর কেসটা এবার একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখা দরকার''

— ''কি ব্লাড টেস্ট আবার ?'', হাঁফ সামলাতে-সামলাতে জয়িতা কোনওরকমে প্রশ্নটা ছোঁড়ে। স্টেরয়েডের কল্যাণে দম'টা কমে আসছে তার একটু-একটু করে।

— ''কিছুই না,'' একটু হেসে ডঃ চক্রবর্ত্তী সবার দিকেই চোখটা ঘোরান, ''ওই TC, DC, ESR, হিমোগ্লোবিন, আর সঙ্গে PFT দিয়ে দিলাম একটা। একটু ভালো করে দেখে নিই একবার, বুঝলেন না ! ওহো, Chest এর একটা Digital X-ray করাবেন তো, মিঃ সেন''।

মিনিট কুড়ি হল ডঃ চক্রবর্ত্তী চলে গেছেন। শ্বশুরমশাই ডঃ চক্রবর্ত্তী লিখে দেওয়া নতুন একটা ঔষধ আনতে বেরিয়েছেন। শাশুড়ি রান্নাঘরের দিকে, নীলের জন্য চা করতে গেছেন, পাপানটাও দিদানের পিছু পিছু গেছে।

— ''আমার কি হয়েছে, বলো তো ?'' হঠাৎ জয়িতা প্রশ্নটা ভাসিয়ে দেয় তারপর নীলের উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলতে শুরু করে, ''এমন তো আমার আগে হতনা, হাঁফ তো আমার বেশ কিছুদিন ধরেই আছে। শেষ দু-তিনবারের অ্যাটাকগুলো যেন কেমন একটু অন্যরকম। শরীরের মধ্যে অন্যধরণের কেমন একটা অস্বস্তি হয়। মাথাটা টিপটিপ করতে থাকে, বুকটায় চাপ লাগে, বড্ড দুর্বল লাগে নিজেকে। বুঝলে সোম, আমি বোধহয় চির রুগ্না হয়ে যাচ্ছি।''

— ''তোমার এই নতুন সিম্পটমগুলো ডঃ চক্রবর্ত্তী কে বলেছো ?'' নীল জয়িতার বিছানার পাশে এসে বসে।

একটু চুপ করে থাকে জয়িতা। তারপর দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেয় খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা অন্ধকারটার দিকে। যেন ওই অন্ধকারের মধ্যে লুকোনো আছে জয়িতার জানতে চাওয়া গহন কোনও প্রশ্নের উত্তর। একটু সময় নিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তরটা দেয় জয়িতা জানলায় চোখ রেখেই, ''না ঃ ! দুর ! আর কত বলব।'' নীল তার দু'হাতে জয়িতার ডান হাত তুলে নেয়, ''জয়ি ? ভেঙে পড়োনা প্লিজ। এই তো টেস্টগুলো হয়ে গেলে ডঃ চক্রবর্ত্তী নিশ্চয় এবার আরও ইনটেনসিভ স্টেপস্ নিতে পারবেন'' নীলের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসে জয়িতা চোখ দিয়ে। ইস্ কত কালি জমে গেছে ওর চোখের নীচে, তারপর ধীরে ধীরে বলে, ''আজ কতদিন পরে আবার জয়ি বলে ডাকলে নীল।''

অসময়ের বৃষ্টিটাকে নীল ডানহাতের তর্জনীতে ছুঁইয়ে নিলো। এখন একটা নাম না জানা বৃষ্টির ফোঁটা টলমল করছে তার তর্জনীর আগায়। আঙুল হেলিয়ে ফোঁটাটাকে নিজের ইচ্ছামতো গড়িয়ে যেতে দিলো নীল। আজ সকালে ও খবর ছিলো না এই বৃষ্টিটার। নীলেরা যখন ফলতা রওনা দিয়েছিলো, তখন এক আকাশ রোদ। মাঝে মাঝেই হালকা মেঘ এসে সে রোদ ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাতে বৃষ্টির আভাস ছিলোনা, নীলের অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিলো। শুধু শ্রী বাসের জানলা দিয়ে আকাশে চোখ রেখে বলেছিলো, ''নীল বৃষ্টি হবে''। ফলতা বাস স্ট্যান্ডে পা দিতেই ফোঁটা ফোঁটা নামতে শুরু করেছিলো জলেরা। এখন অঝোর ঝরছে। আশ্রমে পৌঁছনোর কিছুটা আগে যে বাঁক, সেখানেই একটা পরিত্যক্ত চালা দোকানঘরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে পড়েছে নীল আর শিঞ্জিনি। আর একটু হলেই চলে যাওয়া যেত আশ্রম, আর ক'টা মিনিট সময় পেলেই পৌঁছলো যেত গন্তব্যে। নীল ভাবল, আসলে মেঘ, বৃষ্টি, রোদ্দুরেরা বোধহয় নিয়তির বাড়িতেই থাকে। কখন এসে দাঁড়াবে পথে, জীবনে, আগে থেকে বোঝা মুশকিল। মানুষ কি নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ? বোধহয় না, বুদ্ধিমান মানুষ শুধু নিয়তির সঙ্গে সম্পর্কটাকে এমনভাবে গড়ে নিতে পারে যাতে মনে হয় যে মানুষটি নিয়তিকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। আসলে, তা নয়, মানুষ নিয়তির কাছে বীরের মতো বশ্যতা স্বীকার করতে পারে শুধু। সে বীরত্বে ঝলকানি এমনই যে পৃথিবী ভেবে নেয় যে এ' মানুষটি নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী, শুধু মানুষটি মনে-মনে বোঝে যে সে পরাভূত, পরাজিত। নিয়তির সামনে সে তৃণসম।

এই কথাটাই শিঞ্জিনি বলেছিলো সেদিন কফিহাউসে বসে। নীলের হাতটায় আলতো একটা স্পর্শ উপহার দিয়ে বলেছিলো, ''নীল, যাই ঘটুক, ভেঙে পড়োনা। আমরা কেউই জানিনা, জয়িতার রিপোর্টে কি আসবে। জানবার প্রয়োজনও নেই তেমন ভাবে কারণ ভালো-মন্দ যাই আসুক, আমাদের সেটা মেনে নিতে হবে। নিয়তির যে খেলায় আমরা নিয়ন্ত্রক নই, ক্রীড়নক মাত্র, সে খেলায় ভবিতব্যকে তার নিজস্ব জায়গা সসম্মানে ছেড়ে বীর সন্ন্যাসীর মতো দু'হাতে স্থির বিশ্বাসের অস্ত্রটিকে আঁকড়ে থাকা উচিৎ। বিশ্বাস, নিজের উপর অখন্ড ও অতন্দ্র বিশ্বাস — এমন সব পরিস্থিতিতে একমাত্র তখনই মানুষ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে''।

শ্রী ঠিকই বলেছিলো। প্রাথমিক বিচলনের পর্বটা পেরিয়ে অমনটা করেছে বলেই নীল সামলে নিতে পেরেছে নিজেকে। রিপোর্টটা জানবার রাতে জয়িতার কাছে যায়নি নীল। যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ রিপোর্ট পাওয়ার নির্দিষ্ট দিনটা নিয়ে সে ইচ্ছা করেই একটু ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে রেখেছিলো জয়িতার কাছে, যাতে প্রয়োজনে হাতে একটু সময় পাওয়া যায় নিজেকে সামলানোর। সে রাতে ঘুম আসেনি নীলের চোখে, ব্যালকনির চেয়ারটায় বসে-বসেই কেটে গিয়েছিলো পুরো সময়টা। নীল বুঝেছিলো, ঘুম নেই পাপানের চোখেও। পাপানের ঘরে বেড ল্যাম্পটার বারবার জ্বলা-নেভা দেখে সেটা টের পেয়েছিলো সে। তবু সে রাতে পাপানের কাছে যায়নি সে, পাপান ও আসেনি। খুব সম্ভবতঃ পরস্পরকেই নিজস্ব সময় দিয়ে চেয়েছিলো তারা, ভেবেছিলো দুঃখ নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালে একে অন্যের দুঃখ বাড়িয়ে তুলবে। কখনও-কখনও দুটি কাছের মানুষ মুখোমুখি হলে দুঃখ ভাগ না করে দুঃখের জোয়ারও ডেকে ফেলে। নীল সে রাতে নিজেকে অনেকটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিলো, খিল তুলে দিতে পেরেছিলো আবেগের দরজা-জানলায়। তবু ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকেছিলোই ব্যথার বাতাস। মনকে নিশ্ছিদ্র করবার অভিযানে পরের দিন বেলায় নীল গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো তার শ্রী'র সামনে। শ্রী-নীলের সব কষ্টের শেষ স্টেশন, সব ভরসার প্রথম ও একমাত্র উড়ান।

''বাবু, ডাক্তার তো এলুক নাই, এলেই নাতিটা বাঁচি থাকত আমার'', কথাগুলো তীব্র চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল তথাগতের মনের বুকে-পিঠে। তথাগত অসহায় বোধ করল। পাশের সাংবাদিক ভদ্রলোকও। তথাগত নাম জানে না ভদ্রলোকের, শুধু জানে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ভদ্রলোক হাজির হয়েছেন এই ছোটপেলিয়া গ্রামে। কারণটাও তথাগতের জানা, এক বড় নেতার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন ভদ্রলোক। মুখে কেউ না বললেও তথাগত জানে, কালও এই গ্রামেই কোথাও ছিলেন ওই নেতা। নেতাকে বার দুই দূর থেকে দেখেছে তথাগত, ৫২, ৫৩ বছরের পেটানো, ঝলসানো চেহারা, একটু উঁচু দাত, মাঝারি উচ্চতার এই লোকটিই যে পুলিশ-প্রশাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, ভাবতে অসুবিধে হয়।

বাচ্চাটার দিকে আবার তাকাল তথাগত। মাত্র একটা দিন এই পৃথিবীর জল-হাওয়া উপভোগ করেই চলে গেল মুখ হাঁ করা, চোখ ঠেলে ওঠা বাচ্চাটা। চলে গেল, নাকি, ওকে চলে যেতে হল ? শেষেরটাই ঠিক বোধহয়। কাল বিকেলে ওর বাবাকে পুলিশ তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে জন্মেছিলো ও। শুরু থেকে কোনও শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যায় ভুগছিলো। সাংবাদিক ভদ্রলোক তথাগতকে কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে তিনি নাকি বাচ্চাটার অবস্থা দেখে তাঁর পরিচিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দল রাজী হয়নি। তারা অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছিলো। বলেছিলো, সাংবাদিক ভদ্রলোক চেনা ডাক্তারবাবু এনে বাচ্চার চিকিৎসা করাচ্ছেন খবর পেলে পুলিশ ওনাকেই উৎপীড়ন করতে পারে। এখন বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে মনটা বিষণ্নতায় ভরে গেলো।

মানুষ মূলতঃ যাযাবর। প্রাণীজগতের অন্যান্য সদস্যদের মতো তারও রক্তে খেলা করে ছুটে বেড়ানোর ডাক, এক আশ্রয় থেকে আরেক আশ্রয়ে যাওয়ার লিপ্সা। আসলে, জীবনের গতি বিধি ও বিচিত্র, ভিন্ন ভিন্ন তার রূপ, ভিন্ন ভিন্ন তার চাওয়া ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে। মুহূর্তরা জীবনের নানা মোড়ে আলাদা আলাদা চাহিদার জন্ম দেয় আর সেই চাহিদারাই জীবনের পরবর্তী গতিবিধিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। একজন মানুষ তার জীবনের কোনও পর্যায়েই দাঁড়িয়ে বুক ঠুকে বলতে পারেনা যে জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো তার জানা। একটা মুহূর্তের নড়া-চড়া, হঠাৎ এসে জীবনের প্রবিষ্ট হওয়া একটা ঘটনা মানুষের চলার গতিবিধিকে নিমেষে পরিবর্তন করে দিতে পারে। এটা স্বাভাবিক শাশ্বত। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষই এটা মেনে নিতে পারে না বা মানতে চায় না। আসলে জীবনে ঘটা একটি ঘটনাকে মানুষ তার চলার পথের আশীর্বাদ বলে ধরে নেবে না সীমাবদ্ধতা, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সে বিচার করবে নির্দিষ্ট ঘটনাটিকে, তার উপরেই পুরো বিষয়টি অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিনের পালিত অভ্যাসে জীবনের একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থির করে নেয় এবং সেই গন্তব্যটিকে ছোঁয়ার চেষ্টায় এগিয়ে চলে। মানুষ আসলে ভুলে যায় যে জীবন পথের কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, জীবন একটি যাত্রা শুধু। এই যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়াটুকুই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, কারণ মানুষের হাতে শুধুমাত্র ওইটুকুই আছে এবং এই পথে ফুটে থাকা যাবতীয় ফুল আর কাঁটাকে মানুষের অন্তর থেকে সানন্দে গ্রহণ করে নেওয়া উচিৎ। প্রশ্ন হল, তা হলে কি মানুষের জীবনে লক্ষ্য বলে কি কিছু নেই ? নিশ্চয় আছে। মানুষের জীবনে একটাই বড় লক্ষ্য ''চরৈবতি, চরৈবতি'' পথ চলা, আরও পথ চলা। এই বড় লক্ষ্যকে বিভিন্ন মানুষ তার ক্ষমতা ও স্বভাব অনুযায়ী ছোটো ছোটো লক্ষ্যে ভেঙে নেয়, তাতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে প্রতিটি মানুষের জীবনে লক্ষ্য আলাদা, কিন্তু আসলে তো তা নয়। তফাৎটা ছোটো লক্ষ্যের ক্ষেত্রে, লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার ধরণের ক্ষেত্রে, কিন্তু মানবজীবনের যে আদত লক্ষ্য সে লক্ষ্য সব জীবনের ক্ষেত্রেই এক ও অদ্বিতীয়। আর গন্তব্য ? লক্ষ্য আর গন্তব্যে তফাৎ আছে। গন্তব্য হল সেই স্থানটি যেখানে মানুষ বৃহৎ লক্ষ্যসাধন করতে করতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল। বৃহৎ লক্ষ্য সাধনে যেহেতু মানুষের ভেঙে নেওয়া ছোটো লক্ষ্যগুলি আলাদা এবং লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার পথ ও প্রকারটাও আলাদা, তাই মানুষের গন্তব্যও আলাদা। সবাই বৃহৎ লক্ষ্যের পথে শেষ পর্যন্ত একই দূরত্ব অবধি পৌঁছতে পারে না। যে যতটা পৌঁছতে পারল, তার ততটাই গন্তব্য। এই সার সত্য মানুষের মেনে নেওয়া কর্তব্য এবং এ-ও মেনে নেওয়া উচিৎ যে এই যাত্রাপথে যাই ঘটুক যে মোড়ই হাজির হোক সামনে, যে পরিস্থিতিই, মানুষের উচিৎ হাসিমুখে, শান্তচিত্তে তাকে গ্রহণ করা। কারণ পরিস্থিতি বিচার করাটা মানবজীবনের কর্তব্য নয়, মানবজীবনের কর্তব্য হল, সামনে যাই আসুক, তাকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে কেবলই এগিয়ে চলা।

— ''মিঃ সেন, ভিতরে যাবেন প্লিজ'', ডাকটা কানে আসতেই ঘোরটা কেটে যায় নীলের। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় সে, তারপর পা বাড়ায় ডঃ চক্রবর্তীর চেম্বারের দিকে।

নীল পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে ঘন চাপ অন্ধকারটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপরে । নীল অসহায়ভাবে চারপাশটা দেখল । ছোট্ট অন্ধকার গলিটা পেরোলেই সামনে একটা আলোকিত মোড় অপেক্ষা করে আছে তার জন্য । সত্যিই আছে কি ? নাকি নীল গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র ঝুপ করে নিভে যাবে ওখানকার আলোগুলোও । এলোমেলো হয়ে যাওয়া মাথাটাকে কোনওরকমে সাজানোর চেষ্টা করতে-করতে মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়ালো নীল । সাঁই সাঁই করে ছুটে যাচ্ছে সন্ধ্যার কলকাতা । ছোট বড় গাড়িগুলো দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক, ভীড় উপচোনো বাসগুলো সামনের স্টপেজটায় লোভী দৈত্যের মতো কিছু মানুষকে বমি করবার মতো উগরে দিয়েই গিলে নিচ্ছে আরও কিছু দেহকে । সারাটা দিন বিবিধ উদ্দেশ্যে যাপনের পর মানুষেরা দিনের শেষে পড়ে থাকা উদ্দেশ্যগুলো হতে চলেছে নিজস্ব এবং ভিন্ন গন্তব্যে । সব মানুষেরই কি গন্তব্য থাকে সবসময়ে ? প্রতি পদক্ষেপে থাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ? কে ঠিক করে নেয় তা ? মানুষ নিজে নাকি তার বয়ে চলা জীবনের নিয়তি ঠিক করে দেয় মানুষের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য, মানুষের ইচ্ছার ধার না ধরেই ? নীলের নিয়তি এখন যে উদ্দেশ্যের কথা নীলের চলার পথে সাজাচ্ছে, যে গন্তব্যে ঠেলে-ঠুলে পাঠাতে চাইছে, নীল তো তা চায়না । নীল তো চায়নি, তার জীবনে এমন একটা দিন আসুক নিয়তির এক মুহূর্তের এক ঘোষণা বিধ্বংসী প্রলয়ের মতো দুড়মুড়িয়ে ভেঙে দেবে নীলের গুছোনো, সাজানো সবকিছু ।

ডঃ চক্রবর্তীর শেষের কথাগুলো আরও একবার আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠল তার কানে, তার আঁচ নিমেষে ছড়িয়ে গেল কান থেকে মস্তিষ্কের আনাচে কানাচে, ''ভেরি সরি মিঃ সেন, আমি বারবার Report গুলো নাড়াচাড়া করে দেখেছি, even I talked to my senior also, but it is third stage any how, you can understand HRCT Thorax দেখেই সাস্‌পিসানটা এসেছিলো, bronco biopsy has made it very clear যে লাংসটা খুব বিশ্রীভাবে and I must say খুব তাড়াতাড়ি affected হয়ে গেছে ।''

নীল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো । খুব দ্রুত তার মস্তিষ্কের কোষগুলো কাজ করাটা বন্ধ করে দিচ্ছিলো । কথাগুলোর চেহারা খুব স্পষ্ট হলেও নীলের বুঝে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল । নীলের চোখে মুখে সে অস্বাচ্ছন্দ্যের ছায়া অনুভব করেই বোধহয় অভিজ্ঞ ডঃ চক্রবর্তী আবার কথা শুরু করেছিলেন । খুব নরম ও ধীর ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বলছিলেন কি চেষ্টা করবার কথা তিনি ভাবছেন, কেমো থেরাপি, রেডিয়েশন ইত্যাদি কিছু কথা ক্রমশঃ ঘিরে ধরছিলো নীলকে । নীল অসহায়ের মতো যেন সহ্য করছিলো সব কিছু, তারপর একসময়ে ডঃ চক্রবর্তী তার কাঁধে হাত রেখে ''please, আপনি কোনও ভাবেই ভেঙে পড়বেন না মিঃ সেন । তাহলে ওনার লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে যাবে'' বলতেই একটু হেসে উঠে পড়েছিলো সে ।

এখন কোথায় যাবে নীল ? জয়িতার কাছে ? গিয়ে বলবে, জয়িতা তোমার লাংস ক্যান্সার হয়েছে, তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও । মাঝের সময়টুকুতে আমরা অনেক চেষ্টা রাখবো, দেখাবো অনেক উদ্যোগ এটা জেনেই যে সবটাই অনর্থক ? তুমিও তা জেনে রাখো, এ'সবই কি সে বলবে জয়িতাকে ? কিন্তু, কি ভাবে ? না, না, এখন নয়, নীলের সময় লাগবে । আগে নিজেকে গুছোতে হবে, নিজেকে না গুছিয়ে নিয়ে জয়িতার মোকাবিলা করতে পারবে না সে । তবে কি জয়িতার মা, বাবাকে আলাদা করে আগে বলবে কথাটা ? না, সেটাও করা যাবে না, ওনারা দ্রুত ভেঙে পড়বেন আর সেই ভেঙে পড়াটা ঘটনাটাকে নিমেষে উন্মুক্ত করে দেবে জয়িতার কাছে । শ্রী কে বলা যায়, কিন্তু শ্রী তো এই ক্ষেত্রে . . . . . যতই হোক, এটা নীলের সংসারের একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র । শ্রী অসহায় বোধ করবে শুধু । পাপান । হ্যাঁ পাপান । পাপান কেই সবচেয়ে আগে ব্যাপারটা জানানো দরকার । কারণ, সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী ধাক্কাটা ওই মেয়েটাই খেতে চলেছে । এইটুকু বোঝবার মতো পাপান বড় হয়ে গেছে, আর বড় হয়ে যাওয়া যদি বাকি থাকে কিছু, পাপানের এখন ততটা বড় হওয়ারও সময় এসে গেছে । পাপান এখন কোথায় ? প্রশ্নটায় মনে করতে পারলনা নীল, তারপরেই মনে পড়ে গেল যে পাপান এখন ম্যাথসের কোচিং এ । এখান থেকে বেশীদূরে তো নয়, নীল পা বাড়ালো পাপানের কোচিং ক্লাসের দিকে ।

ভারী অবাক হয়ে গেলো পাপান । ক্লাস থেকে বেরিয়েই বাপিকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলো সে । বাপির চোখ মুখ দেখে বিস্মিত লাগছিলো তার । শেষে বাপি যখন 'জরুরী কথা আছে' বলে সামনের কফিশপটায় নিয়ে গিয়ে ঢোকালো, পাপানে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল ।

কফিশপটায় ঢোকা থেকে চুপ করে বসে আছে বাপি, একটাও কথা বলছেনা । মাথা নীচু করে নুনদানিটা নাড়াচাড়া করছে খালি । মাঝে দু'বার মাথা তুলেছিলো কিছু বলবে বলে, কিন্তু যেন যথেষ্ঠ শক্তি সঞ্চয় না করতে পেরে মাথা নামিয়ে নিলো আবার । পাপান বুঝতে পারছে খুব সিরিয়াস একটা কথা আছে কিছু, কিন্তু সেটা কি নিয়ে ? ইমন ? বাপি কি ইমনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা জানতে পেরে গেল ? না কি অন্য কিছু ? হঠাৎ মাথায় বিদ্যুতের মতো খেলে গেল আতঙ্কটা । আজ তো বাপির মা-র Report এর বিষয়ে ডঃ চক্রবর্তীর কাছে যাওয়ার ছিলো । তবে কি মা-র ব্যাপারেই কিছু --- ? হঠাৎ ঘোরে পাওয়া মানুষের মতো এক ঝাঁকুনিতে মাথা তুলল বাপি, তারপর বলতে শুরু করল, ''পাপান, একটা খবর আছে । খারাপ খবর । তোর মা . . . . . মানে জয়িতার . . . . . পাপান,'' শেষের কথাগুলোয় আরও একটু জোরে আর দ্রুততায় শেষ করল বাপি, ''জয়িতা is suffering from third stage lungs cancer'' পাপান নিমেষে পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে গেল ।

আহ ! এই গন্ধটা বড় চমৎকার লাগে তথাগতর । গোবর দিয়ে উঠোন নিকোনোর গন্ধ । তথাগত জানে, সে ওঠবার আগেই এই কাজটা রোজ সেরে ফেলে ফুলমনি দি । মাধবদা ভোর হতে না হতেই সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে পড়ে তার অফিসের দিকে । এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে চড়কতলির মোড়ের ক্যুরিয়ার অফিসটায় তাকে পৌঁছতে হয় সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে । আগেরদিনের রাখা ভাত লেবু লঙ্কা দিয়ে একথালা সাঁটিয়ে সেই যে বেরোয় মাধবদা, ফিরতে ফিরতে বিকেল পাঁচটা । একই সঙ্গে ভাত খেয়ে নেয় ফুলমনি দিও । দূরের জঙ্গলে যায় শুকনো পাতা আর ডাল কুড়োতে । কিছুটা জ্বালানি, কিছুটা বিক্রি । কিন্তু বেরোনোর আগে উঠোনটা রোজ নিকোতে ভোলেনা নিঃসন্তান ফুলমনি দি । যবে থেকে এখানে এসেছে তথাগতরা, এখনও আরও দিন কুড়ি থাকা উচিৎ সমীক্ষার কাজটা শেষ করবার জন্য । তথ্যের যে জাল ছড়িয়েছে সে চারিদিকে এখন সেটাকে গুটিয়ে তুলতে হবে । নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে সাজিয়ে নিতে হবে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে । আসলে, তথ্যসংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে গেলেও তথ্যগুলোর জট ছাড়িয়ে সাজিয়ে নেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে আরও ছোট্ট একটা কোনও তথ্য প্রয়োজন । নচেৎ প্রাপ্ত তথ্যগুলোর মধ্যে যথাযথ সেতুবন্ধ হওয়া কঠিন । ঠিক সেই কাজটি করতে এখানে রয়ে গেছে তথাগত । কিন্তু নিজের কাছে সে যদি সত্যিটা স্বীকার করতে চায়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে তার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছেনা তেমন । এমন নয় যে কলকাতা ছেড়ে থাকাটা কঠিন হয়ে উঠছে তার পক্ষ্যে । সত্যি বলতে কি, এই জায়গাটা ভারী চমৎকার লাগে তার । মাধবদার বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে চোখ রাখলে একটা ছোট্ট শালবন চোখে পড়ে । ছোট্ট অথচ গভীর । বিকেলের দিকটা চলে যেতে থাকা সূর্য্যের আলো শালবনের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে এসে পড়তে থাকে মাধবদার দরজার গোড়ায়, যেন ওই আলোগুলো খুঁজছে তথাগতকে । এই সময়টা পাখিদের ডাকাডাকিতে যেন সঙ্গীতমুখর হয়ে ওঠে । তথাগত নজর চালিয়ে দেখে যদি পাখিগুলোকে দেখতে পায় । কিন্তু দুষ্টু পাখিগুলো কিছুতেই পাতার আড়াল থেকে বেরোয় না, শুধু অদ্ভুত সব সুরে তথাগতকে আনমনা করে দিতে থাকে । এই সময়টাতেই গরু চড়িয়ে বাড়ি ফেরে রাধা বৌদি । তথাগতকে দেখলেই দাঁড়ায় এক ঝলক মিষ্টি হাসে ।

একটা কথা পরিস্কার বুঝেছে তথাগত যে সমীক্ষা এক জিনিস, সমীক্ষা লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে শহরে বিশ্বাসযোগ্য প্রেজেন্টেশন দিয়ে প্রশংসা পাওয়া এক জিনিস, কিন্তু এই প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রকৃত কষ্ট, প্রকৃত অভাব দূর হওয়া আরেক জিনিস । বীতশ্রদ্ধ তথাগত । সে ফিরে যাবে, আজই । কালরাতেই ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে সে । আজ একটু বেলা বাড়লেই রওনা দেবে । পূজার মোবাইলে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে কাল । গত কয়েকদিন ধরেই আবার কথা বলছে তারা । একটা ঝোঁকের মাথায় তথাগতর এখানে আসাটাকে বিশ্লেষণ করেছিলো তারা ।

তথাগত উঠে দাঁড়িয়ে সোজা সরু মোড়টার দিকে দৌড়ালো । ''অ্যাই, রুক যাও, নেহি তো গোলি চালা দেঙ্গে'' বলতে-বলতেই একটা কান ফাটানো আওয়াজ আর ডান পায়ের কাছে একটা তীব্র ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল তথাগত । গুলিটা সজোরে এসে লাগতেই গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে । তথাগতের মাথা টলছে, কাজ করছে না কোনও কিচ্ছু । সে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতেই পিঠে এসে লাগলো গরম সিসার স্পর্শ । মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তথাগত চোখের সামনেটা কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া, দেহটা যেন তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কোথাও, তথাগতর আশপাশটা যেন আশ্চর্য্যরকমের নিস্তব্ধ, শুধু কিছু ভারী আওয়াজ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এসে থমকে দাঁড়ালো তথাগতর পাশে । কি একটা যন্ত্রণা উঠে আসছে বুকের ভিতর

থেকে, আর কিছু ছবি, ছেঁড়া-ছেঁড়া অসংলগ্ন। পূজা, হ্যাঁ, হ্যাঁ পূজাই তো — ডাকছে তাকে। মা আর বাবা হাসতে হাসতে কোথায় যেন সরে গেল। নীলদা কি সব বলছে, তথাগত বুঝতে পারছে, কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছেনা। এ'সব কি হচ্ছে ? তবে কি সে . . . . . ? আহ ! আর কিছু দেখা যাচ্ছেনা কেন ? আর কিছু শুনতে বুঝতে পারছে না কেন সে ? একটা কালো পর্দা দুলছে চোখের সামনে। ওই পর্দাটার কালো রঙটা এত গাঢ় হয়ে উঠছে কেন ? সব কিছু যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একটা কালো বর গহ্বর যেন সজোরে টানছে তথাগতকে। তথাগত নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। পূজা কোথায় ? বাবা ? মা ? দুম করে সব আলো নিভে গেল হঠাৎ। একটা বুট পরা পা উল্টে সোজা করে দিল তথাগতকে। একটা বন্দুকের বেয়নেট একটুখানি ছুঁচলো নাকের ডগা। ''মর গয়া'', ঘোষণা করে উঠল একজন।

*** *** ***

জয়িতার হাসি পেয়ে গেল। সেই কখন থেকে পিঁপড়েটা পাঁউরুটির টুকরো টাকে ঠেলে ঠুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। প্রায় আধঘন্টা হয়ে গেল জয়িতা দেখে চলেছে পুবদিকের জানালাটার তাকে পিঁপড়েটার কার্যকলাপ। এই আধঘন্টায় পিঁপড়েটা বোধহয় তিন আঙুলও এগোতে পারেনি, নিজের তুলনায় এতবড় টুকরোটাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে কিনা, তারও ঠিক নেই, তবু চেষ্টার অন্ত নেই। আচ্ছা, ওই টুকরোটাকে না নিয়ে যেতে পারলেই বা ওর কি হবে ? সরে যাবে ওটা খেতে না পারলে ? অন্য খাদ্য জুটবে ? অথবা ওটা খেলেই বেঁচে থাকবে আজীবন ? আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে সব কিছু ? জয়িতার ইচ্ছা হল পিঁপড়েটাকে বলে, 'অ্যাই, আমাকে দ্যাখ। আমিও তো কত কিছু আঁকড়ে ছিলাম, আছি এখনও। মনে হত, এসব আমার চিরকালের। সারাজীবন আঁকড়ে থাকব এ'সব। পারছি ?' জয়িতা সব বোঝে, সবটাই বুঝে ফেলেছে। নীলটা হাস্যকর ভাবে আড়াল করবার চেষ্টা করছে সবকিছু, মা-ও। আর পাপান ? সে তো কত বড় হয়ে গেছে এ'কদিনেই। বেশ একটা লুকোচুরি খেলা চলছে কিন্তু। ওরা জয়িতার থেকে অসুখটা লুকোচ্ছে আর জয়িতা ওদের থেকে লুকোচ্ছে তার বুঝে যাওয়াটা। জয়িতার আবার হাসি পেয়ে গেল। আজকাল হাসি পেলেই মাঝে-মাঝে চোখদুটো এমন জ্বালা করে ওঠে ? করুক জ্বালা, ক'দিনই বা করবে। আচ্ছা, মানুষ এত বোকা হয় কেন ? একটা প্রাণ জন্মানোর সময় তো কত হইচই, আনন্দ, তাহলে সে প্রাণের চলে যাওয়াটা সহজভাবে নেওয়া যাবে না কেন ? আসলে অভ্যাস করছে রোজ, তাই বোধহয় ভয়টা আস্তে আস্তে হজম করে ফেলছে। জয়িতার খুব ইচ্ছা, যখন সময় আসবে, মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে হাসবে ও মায়াগুলো সযত্নে মন থেকে একটু একটু করে সরিয়ে রাখা ভালো এখন থেকে। এই তো, আগে নীলের সঙ্গে শিঞ্জিনিদির বন্ধুত্বটা মনের কোণে কোথাও খচখচ করত জয়িতার, এখন আর করে না। সত্যি তো, নীলের ও'সব লেখালেখি, ভাবনা-চিন্তার শরিক কোনওদিনই হতে পারেনি সে।

এখন নীল যদি সেসবের একজন সঙ্গী পায়, তার আপত্তি করা তো উচিৎ নয়। তার আর শিঞ্জিনিদির বৃত্তটা তো আলাদা। আর শিঞ্জিনিদির ওইদিকটাই বা সে শুধু দেখবে কেন ? এটা কেন দেখবে না যে শিঞ্জিনিদি দু-একদিন অন্তরই দেখতে আসে তাকে, কতক্ষণ বসে তার কাছে, কত গল্প করে, মাথায়-গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। শিঞ্জিনিদির চোখ থেকে ঝরে পড়া এই স্নেহটাই এখন দেখতে চায় সে, দেখতে চায় নীলের উদ্বেগ, পাপানের বড় হয়ে যাওয়া। যাওয়ার আগে সব কিছু ভালোই দেখে যেতে চায়, সে। খারাপ কিছু দেখে মন খারাপ করে যাবেনা জয়িতা। আগে এমন করে ভাবতে পারত না, এখন জয়িতার ভালো লাগে এমন করে ভাবতে, মনে শান্তি পায়, আরাম পায়।

জল পড়ার শব্দ বয়ে একটা মেসেজ এল মোবাইলে। প্লোমো এস. এম. এস — মোবাইল হাতে তুলে দেখল জয়িতা। একটা ফোন করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কাকে করবে ? নীলকে ? না ঃ নীল এই সময়টায় খুব ব্যস্ত থাকে অফিসে। আগে ফোনই ধরত না, এই অসুখটা হওয়ার পর থেকে অবশ্য জয়িতার সব কটা কল ধরে, যথাসম্ভব ধৈর্য্যের সঙ্গে কথা বলে, শোনে। কিন্তু সে তো জয়িতা চলে যাচ্ছে বলে, দুর ! অমন করুণা নিতে ভালো লাগে না। আরে, এই অসুখটা হয়েছে বলে জয়িতার অনুভূতিগুলো তো আর নষ্ট হয়ে যায়নি, বরং নতুন করে ফিরে এসেছে বলা যায়। আসলে, মানুষ যখন প্রত্যাশাশূন্য করে ফেলতে পারে মনকে তখন তার চিন্তা-ভাবনাগুলোও অনেক পরিস্কার হয়ে যায়। যেমন জয়িতার নিজেরই হয়েছে। পাপান তো স্কুলে এখন। পাপানটা বোধহয় প্রেমে টেমে পড়েছে। হাল-চাল দেখে তো তাই মনে হয়। জয়িতারও

তো একদিন ওই বয়সটা ছিল। তা মন্দ কি ? যে বয়সের যা। আর তাছাড়া জয়িতাদের যুগ তো আর নেই যে বাবা-মাদের সবসময়ে একটা গেল গেল ধর-ধর ভাব, তাদের মেয়েদের নিয়ে। এখনকার ছেলে-মেয়েরা নিজেদের টা খুব ভালোই বোঝে পাপানকে জিজ্ঞাসা করতে হবে একদিন, ভাবল জয়িতা।

হঠাৎ কি মনে হতে শিঞ্জিনিদির নম্বরটা টিপে ফেলল জয়িতা। ধুর, কেটে দিল। ব্যস্ত আছে বোধহয়। সবাই ব্যস্ত, জয়িতার জন্য কারও হাতেই তেমন সময় নেই দেখা যাচ্ছে। ও মা, না, না, এই তো আবার জলপড়ার শব্দ একটা, শিঞ্জিনিদির মেসেজ, ''অ্যাই ছোট্ট মেয়ে, একা লাগছে ? একটা এন. জি. ও র মিটিং এ আছি। দাঁড়াও, সেরেই তোমার কাছে আসব, অনেক গল্প করব। কেমন ?'' জয়িতার মনটা দ্রুত ভালো হয়ে গেল। আবার মেসেজ, শিঞ্জিনিদিই, ''মাসিমাকে বলো, খিদে পেয়েছে, আলু পরোটা খাব আর চা''। এবার জয়িতা হেসে ফেলল, ''মা শিঞ্জিনিদি আসছে, ওর ফেবারিট আলু পরোটা বানাও''। চেঁচিয়ে বার্তা দিল সে। বেশ মজা লাগছে জয়িতার, শিঞ্জিনি দি এলে আজ অনেক গল্প করবে।

আচ্ছা, পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষই কি পাগল হয় ? এই জয়িতাটা একদম পাগল একটা। বাসে উঠে সিটটা পেয়ে মনে আরাম হতেই কথাটা দ্রুত চলে এল মাথায়। যেই শুনেছে শিঞ্জিনি আসছে আর ওর তর সইছেনা মেয়েটার, দুটো এস. এম. এস. এসে গেছে ইতিমধ্যেই ''কত দেরী ?'' এই মেয়েটাকে যত দেখে ততই অবাক হয়ে যায় শিঞ্জিনি। ও খুব ভালো করেই জানে নীলের সঙ্গে শিঞ্জিনির ঘনিষ্ঠতার কথা, কিন্তু তা নিয়ে মনে কোনও গ্লানি নেই। অম্লান বদনে আর নীলের নামে নানা অনুযোগ ও করে। নাঃ, মেয়েটা যাওয়ার আগে বড্ড মায়া বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর মেয়েটার মাথার চুলগুলো কত কমে এসেছে, দুটো কেমোথেরাপি হয়ে গেল তো। নীলটা এত বোকা ? ভাবে, জয়িতা কিছু ধরতে পারছে না তেমন। নীলের ''তেমন কিছু হয়নি, সেরে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই'' মার্কা কথা শুনে যেন বিশ্বাস করবে মেয়েটা ! শিঞ্জিনি অনুভব করতে পারে, সব বোঝে জয়িতাটা। আর বোঝে বলেই অত শান্ত মনে আছে। না হলে প্রশ্ন করে করে উত্যক্ত করত। নীলটা কোনওদিনই মেয়েদের বুঝতে পারল না। শিঞ্জিনিরই সব কথা বোঝে নাকি ও ? মাঝে-মাঝেই কথার বাঁকগুলো বুঝতে না পেরে দিশাহারা হয়ে তাকিয়ে থাকে। তবে নীল ভালোবাসতে জানে, মন উজাড় করে দিতে জানে। এমন দেওয়া আগে কখনও কারও কাছে পায়নি শিঞ্জিনি। এতখানি বয়স হয়ে গেল তো, শিঞ্জিনিকে এমন করে কেউ কখনও ভালোবাসেনি। ছেলেমানুষের সারল্যে ভালোবাসে নীল। ওঃ নীল, তুমি কি বোঝো, তোমার শ্রী তোমায় কতটা ভালোবাসে। তুমি কি জানো, তোমার শ্রী-ও এমন করে কখন ও কাউকে ভালোবাসেনি, বাসতে পারেনি। বারবার চেয়েছে দিতে, বারবার ধাক্কা খেয়েছে, অবশেষে তুমি নীল, অবশেষে একজন।

বাসে ওঠবার সময় রোদ্দুরটা বেশ চড়া ছিল, এখন মেঘের হালকা একটা আস্তরণ উগ্রতাটাকে চাপা দিয়েছে। ভালো লাগছে দুপুরটাকে। বেল বাজাতেই হুড়মুড়িয়ে দরজাটা খুলল আর ''এসো, এসো'' বলে শিঞ্জিনিকে একটানে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল জয়িতা।

বাইরে টিপটিপ করে পরতে থাকা বৃষ্টিটার দিকে তাকিয়ে রইল শীর্ষ। রুমকি বৃষ্টি ভালোবাসত। গোঁড়া মিত্রবাড়িতে বাড়ির বউ এর ছাদে গিয়ে ভেজবার চল ছিলোনা বলে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ও বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ছুঁতে চাইত, বলত, ওর বৃষ্টি হতে ইচ্ছা করে। আরও বলত, ''শীর্ষ, তুমি একটু ভালো দেখো না প্লিজ। দ্যাখো, এই বৃষ্টি, এই রোদ, হাওয়া — এ'সব কিছুই তো তুমি দেখতে পাওনা তোমার ওই বন্দুক, পেশী আর টাকার পাহাড়ে ঢাকা পড়ে গিয়ে। একটু ভালো হয়ে যাও গো প্লিজ।'' বলতে বলতে শীর্ষর বুকে হাত রাখত রুমকি। আচ্ছা, শীর্ষ যখন কোনও উত্তর দিতনা এ'সব কথার কিংবা ''ভ্যাট !'' বলে দূরে সরে যেত, তখন কি খুব কষ্ট পেত রুমকি ? এখন রুমকি কোথায় ? বৃষ্টি হয়েছে ও এখন ? মরলে তো মানুষ নিজের ইচ্ছে মতো যা কিছু হতেই পারে। রুমকি কি সত্যিই বৃষ্টি হতে পেরেছে ? এই যে শীর্ষর ঘরের জানলার বাইরের বৃষ্টিটা, ওটাই কি রুমকি ? নাকি রাতে বিছানায় শুয়ে পাড়ার দোর্দন্ড প্রতাপ মস্তান শীর্ষর চোখে যা ঝরে, সেই বৃষ্টিটাই রুমকি ? ঝরতে ঝরতে রুমকি কি দেখতে পায় যে তার কথা মতো শীর্ষ এখন ভালো হয়ে গেছে ? রুমকি কি বুঝতে পারে এই দু'মাসে মস্তান শীর্ষর লাশের ভিতর থেকে উঠে বসেছে একটা ভালো শীর্ষ ? শীর্ষ অবাক হয়ে যায়, নিজেকে দেখে, নিজের ভেতরকার পরিবর্তন দেখে শীর্ষ নিজেই অবাক হয়ে যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে শীর্ষ। ভাবে, যদি এই শীর্ষটা টিকেছিলো কোথাও না কোথাও, তাহলে মস্তান শীর্ষটা এতদিন মাথা তুলে রাখতে পারলো কেন ? কেন আরও একটু আগে উঠে বসল না ভালো শীর্ষটা ? তাহলে তো রুমকিটা কে এইভাবে -----। বাইরের বৃষ্টিগুলো বেয়াদবের মতো ঝরতে চাইছে শীর্ষর চোখ দুটো থেকে। নীলদা আর শিঞ্জিনিদি বসে আছে ঘরে। তার দিকেই তাকিয়ে আছে শীর্ষ। দ্রুত নিজের চোখের বৃষ্টির দোকানের ঝাঁপটা বন্ধ করে দিলো।

প্রায়ই আসে নীলদা, সঙ্গে শিঞ্জিনিদি। এই শিঞ্জিনিদিকে আগে কখনও দেখেনি সে। এও ডামাডোলে ভালো করে জানতেও চাওয়া হয়নি পুরো পরিচয়টা। শুধু এ'টুকু বুঝেছে, শিঞ্জিনিদি নীলদার খুব ভালো বন্ধু আর ভীষণ ভালো মানুষ। একেকজন থাকে না, যার সামনে দাঁড়ালে চোখ এমনি থেকেই মাটির দিকে নেমে আসে, শিঞ্জিনি ও'রকম। যেদিন রুমকি, ভানুদারা মারা যায়, সেদিন খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছিলো নীলদা। পুরো সময়টা শীর্ষর পাশে ছিলো, নানা পুলিশি ঝামেলা সামলাচ্ছিলো। নীলদার মতো একজন মানুষ পাশে এসে দাঁড়াতে খুব সুবিধা হয়েছিলো শীর্ষর সেদিন। অমন একজনকে শীর্ষর পাশে দেখে পুলিশ বেশী ট্যা-ফু করেনি, না হলে শীর্ষর মাথাটা খারাপ করে ছেড়ে দিত। নির্ঘাৎ। তারপর থেকে নীলদা মাঝে মাঝেই শীর্ষর কাছে আসে, চুপ করে বসে, কিছু কথা বলে। শীর্ষর সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে তা হল এই দু'মাসে নীলদা কিন্তু একবারও জানতে চায়নি ঘটনাটা কি ভাবে আর কেন হল। শুধু বলেছে, ''মন শক্ত কর শীর্ষ। যা ঘটে গেছে, তা ঘটে গেছে। তোর জন্য অন্য এক জীবন অপেক্ষা করছে''। ''অন্য জীবন ?''শীর্ষ অবাক হয়েছে। জানতে চেয়েছে, ''মানে''। ''এখন নয়, আগে নিজেকে আরেকটু সামলে নাও শীর্ষ। তারপর। তোমার এখন নিজের সঙ্গে সময় কাটানো ভীষণ দরকার।'' জবাবটা এসেছে শিঞ্জিনিদির দিক থেকে। নীলদা তার কাছে আসতে শুরু করবার তিনবারের বার থেকে আসছে শিঞ্জিনিদি। প্রথম দিন এসে, আলাপ পরিচয়ের পর সটান হাত রেখেছিলো শীর্ষর কাঁধে, বলেছিলো, ''শীর্ষ, তুমি রুমকিকে খুব ভালোবাসো, তাই না ? তাহলে একটাই কাজ করো, রুমকি যেমন চেয়েছিলো, তেমন হও। দেখো রুমকির ভালো লাগবে''। এমন করে এ'সব কথা আগে কখনও কেউ বলেনি শীর্ষকে। অত শোকের মধ্যেও শীর্ষর ভালো লেগেছিলো শুনতে, কথাগুলো কি করে যেন কানের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়েছিলো শীর্ষর ভিতরে। সত্যি বলতে কি, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অনেকেই আসে শীর্ষর কাছে। শোক জানায়, ভালো-ভালো কথা বলে। কিন্তু শীর্ষর সত্যিই মন থেকে ভালো লাগে নীলদা আর শিঞ্জিনিদি এলে। মনে হয়, এই দুটো মানুষ বড় আন্তরিকভাবে এসে দাঁড়াচ্ছে তার পাশে। আর একজন মানুষ। শীর্ষর বাবা, বাবা এসে দাঁড়িয়েছে শীর্ষর পাশে।

শীর্ষ তার পছন্দসই পথে হাঁটতে শুরু করবার পর থেকে বাবা দূরে সরে গিয়েছিলেন। শীর্ষ তার পথে যতই এগিয়ে গিয়েছে বাবা যেন ততই দূরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলো। শীর্ষ যেটা এখন বোঝে। সারাদিনে বাবার সঙ্গে দেখাই বা হত কোথায় ? আর দেখা হলেও কেবল চোখ নামিয়ে চলে যাওয়া বা বিজয়াতে নিঃশব্দে প্রণাম আর অস্ফুট আশীর্বাদের দেওয়া নেওয়া। রুমকি মারা যাওয়ার রাতেই কি ভাবে যেন খবরটা পেয়ে ব্লু মুনে হাজির হয়েছিলো বাবা। বেশীক্ষণ থাকেনি অবশ্য, চলে এসেছিলেন। সেই শুরু। তারপর থেকে নিয়মিত শীর্ষর ঘরে আসে বাবা। কথা যে এখনও তেমন হয়, তা নয়। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই হয়তো চলে যায়, কখনও হয়তো শীর্ষর পাশটায় বসে পিঠে মাথায় সামান্য হাত বুলিয়ে দিয়ে উঠে চলে যায়। শীর্ষর কেন জানেনা, সেই সময়গুলোতে খুব কান্না পেয়ে যায়। খুব ইচ্ছা করে বাবার হাত ধরে টেনে আরেকটু বসতে বলে। কিন্তু পারেনা, মাঝের বয়ে যাওয়া সময়টা যেন একটা পাঁচিল তুলে রেখেছে যেটা ভাঙতে আজও শীর্ষর হাত ওঠেনা সংকোচে। অথচ শীর্ষ মা'র থেকে শুনেছে, বাবা নাকি মা কে বলেছে, ''ওর দিকে সবসময়ে খেয়াল রেখো। ছেলেটা খুব কষ্টে আছে। বড় কঠিন সময় যাচ্ছে ওর''।

— ''শীর্ষ, আমাদের সঙ্গে একদিন এক জায়গায় যাবি ?'' হঠাৎ নীলদা প্রশ্নটা করে চমকটা ভেঙে দেয়।

— ''কোথায় ?'' শীর্ষ জানতে চায় একটু অবাক সুরে।

— ''ফলতা''। উত্তরটা আসে শিঞ্জিনিদের গলা থেকে।

ফলতা ? সেখানে কি আছে ? কেন শীর্ষকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইছে নীলদারা ? শীর্ষর জানতে ইচ্ছা হয় । কিন্তু সবকটা প্রশ্নকে গিলে ফেলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় শীর্ষ, ''যাবো'' ।

মাথার উপর গোল হয়ে পাক খাচ্ছে চিলটা । মাঝে মাঝে নেমে আসছে আবার উঠে চলে যাচ্ছে । আকাশটা আজ খুব পরিচ্ছন্ন হয়ে আছে । কতকগুলো সাদা-সাদা মেঘ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে খালি । চিলটা সে আকাশের গায়ে, এমনভাবে উড়ছে যেন একটা বিন্দু অবয়ব হয়ে গিয়ে আবার বিন্দু হয়ে যাচ্ছে । শেষ দুপুরে পাচতলার এই ছাদে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা থাকে । শুধু এই নিস্তব্ধতাটাকে আঁকড়ে ধরতেই এই সময় রোজ ছাদে চলে আসে পূজা । সারাদিনের অগণন শোকজ্ঞাপন আর স্মৃতি হাতড়ানোর ফাঁকে এই সময়টুকুই পূজার নিজস্ব । এই সময়টুকুতেই সে নেড়ে-চেড়ে দেখতে পারে নিজেকে তার নিজের তথাগতকে । একমাস হতে চললো তথাগত নেই । তথাগত যে নেই, সেটা বিশ্বাস হতেই অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল পূজার । আগের রাতেও তো কথা বলেছিল তথাগত তার সঙ্গে, বলেছিল ফিরে আসছে । তবে কি হল ? তথাগত যে মারা গেছে সেটা জানতে-জানতেই ঘটনার পর প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছিল । যে এন. জি. ও র হয়ে তথাগত জঙ্গলমহল গিয়েছিল, প্রথম ফোনটা তাদের থেকেই এসেছিল পরেন দিন । সকালে । তারপর আরেকটা ফোন স্থানীয় থানা থেকে । তথাগতকে নিতে জঙ্গলমহলে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল নীলদা । পুলিশ তথাগত-র গায়ে উগ্রপন্থী তকমা সেঁটে দিয়েছিল । নীলদার কাছে বারবার প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে তথাগত উগ্রপন্থী এবং সে যৌথবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে । বলা হয়েছিল তথাগতর কাছে বন্দুক পাওয়া গেছে । নিউজ চ্যানেল আর খবরের কাগজেও এই প্রচারটা চালানো হচ্ছিল । আসলে, প্রশাসন কখনই দোষ করতে পারেনা, The king can do no wrong । দোষ আর দায় স্বীকারের চেয়ে অনেক সহজ অন্য দিকের মানুষটার গায়ে খুব দ্রুত একটা স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া । এ'সব কিছুই পূজা জেনেছে দিন দশেক হল । তথাগত'র এইভাবে চলে যাওয়া সহ্য করতে পারেনি সে । প্রথম পনেরো দিনের মতো উঠিয়ে বসানোই যায়নি তাকে । কেবলই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছিল সে । এখন পূজার মনে হয়ে ওই সময় বারবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা ভালোই হয়েছিল তার পক্ষ্যে । সেই সময়গুলো তো শোকটা ভুলে থাকতে পারছিল সে ।

না হলে কি করে পূজা ভুলবে তার তথাগত কে ? তথাগত যে তার সব প্রেম, সব চাওয়া সব ঝগড়া মতদ্বৈধ নিয়ে বারবার এসে দাঁড়ায় পূজার মনের দরজায় । পূজার ঘুম এখন আসে ঘুমের ট্যাবলেটে ভর দিয়ে । যতক্ষণ জেগে থাকে পূজা, সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাতে ঘুমতে যাওয়া অবধি, কেবল তথাগত তথাগত আর তথাগত । পূজার মন যাতে বিচলিত না হয়ে পড়ে, তাই তথাগতর যাবতীয় স্মৃতি ফ্ল্যাটের সব জায়গা থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে ফেলা হয়েছে । কিন্তু এভাবে কি একটা মানুষকে আরেকটা মানুষের থেকে সরিয়ে ফেলা যায় ? পূজার মনের গভীরে, পূজার চেতনে-অবচেতনে যে তথাগত অহরহ ছোটখাটো স্মৃতিদের ফিরে আসায় উঁকি মারতে থাকে, সে তথাগতকে সরিয়ে ফেলবে কে ? সে তথাগত যে আর কারও নয় । সে তথাগত যে পূজার একদম একার, নিজস্ব । চকিৎ এ অসিচালনার মতো পূজার স্মৃতিতে ঝলক দিয়ে যায় সে, রক্তক্ষরণ ঘটায় । বেশীর ভাগ দিনই এটা ঘটে দুপুরে যখন সকাল সন্ধ্যার শোকজ্ঞাপনায়ীদের ভিড়টা থাকে না । তখনই ছুটে ছাদে চলে আসে পূজা । নীল আকাশের তলায় বসে শোক ওড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে । আকাশের বিশালত্বে, মেঘেদের ইতঃস্তত পদচারণায় হারিয়ে দিতে চায় চিন্তাগুলোকে, নির্ভার করতে চায় মনটাকে । তবু পারে কই ? বারবার সে ফিরে আসে তথাগত, ঘিরে ধরে পূজাকে । উফ । তথাগত, তুমি কেন গেলে ? কোথায় গেলে; ? ঝরঝড়িয়ে বৃষ্টি নেমে এল পূজার চোখে ।

নিজেকে অনেকক্ষণ কাঁদতে দিল পূজা । একান্তে কাঁদতে পারলে হালকা লাগে তার । অনেকটা জল আর অনেকটা শোক বয়ে যাওয়ার পরে স্তিমিত হল পূজার স্নায়ু । এখন ভীষণ একটা ঘুম পাচ্ছে । পূজা জানে, এ' ঘুম আসবে না, তবু শান্ত চোখে ছাদেই শুয়ে পড়ল পূজা । মনটা এখন একটু থিতু হতে চাইছে তার ।

মাথার উপর চিলটা পাক খাচ্ছে এখনও । ওর কি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে কোনও ? নাকি কিছু করবার নেই বলেই ভেসে থাকছে খালি পূজার মতো ? তার জীবনে এখন উদ্দেশ্য কি ? কি তার বাকি দিনগুলোয় বেঁচে থাকবার রসদ ? ভাবতে চাইল পূজা । নাঃ পূজা এ'সব এখন ভাবতে পারছে না । শুধু একটা ক্ষত বারবার বুকের মধ্যে খোঁচা মারতে থাকে, রক্ত

ঝরাতে থাকে, সেটা হল তথাগতর গায়ে দেগে দেওয়া উগ্রপন্থী তকমা, অপবাদ । না উগ্রপন্থী হওয়াটা অপবাদের পর্যায়ে পড়ে বলে মনে করেনা সে । কিন্তু যে যা নয়, তার গায়ে সেই পরিচয় সেঁটে দেওয়াটা অপবাদই, সত্যের অপলাপ তো বটেই । প্রশাসন শক্তিশালী, প্রশাসন সর্বশক্তিমান বলেই নিজের দোষ ঢাকতে অনর্থক একটি মানুষকে নির্দিষ্ট একটি পরিচয় চিহ্নিত করে দিতে পারেনা এ'ভাবে । এ' অন্যায় । এর প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ । নীলদা করতে চেয়েছিল, প্রশাসনের বিরুদ্ধে সুবিধা করে উঠতে পারেনি । তাছাড়া নীলদার জীবনে এখন ঝড় যাচ্ছে । তার থেকে বেশী সময় আর উদ্যোগ আশা করাটা এখন অমানবিকতা । কিন্তু তবু পূজার মনে হয় যে এর একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ, আসল সত্যটা সবার সামনে আসা উচিৎ । সতর্ক করা উচিৎ প্রশাসনকে, না হলে আরও অনেক তথাগতদের গায়ে দেগে দেওয়া হবে অনর্থক সব তকমা । তাছাড়া মিছিমিছি কেন তথাগতই বা সহ্য করতে যাবে এ'সব আরোপিত পরিচয় ? তথাগত আজ নেই বলে কি কোনোখানেই নেই ? না, পূজাই করবে এর প্রতিবাদ, তাকেই করতে হবে এ' কাজটা । তথাগতকে ভালোবেসেই করবে সে এ' প্রতিবাদ । কিন্তু কিভাবে ? অনেকক্ষণ ছাদে চুপ করে বসে রইল পূজা । তারপর ধীরে ধীরে মোবাইলটাকে হাতে তুলে নিয়ে রিং করল । ওদিক থেকে সাড়া আসতেই পূজা তুলে নিয়ে রিং করল । ওদিক থেকে সাড়া আসতেই পূজা খুব প্রত্যয়ী গলায় বলল, ''শিঞ্জিনিদি, আমি আজ বা কাল সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে তথাগতর ব্যাপারে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করতে চাই'' ।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট । নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন । তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি । তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ১০

(১৫)

এনভেলাপ দু'টো বাপ্পার হাতে তুলে দিয়ে, সিস্টার বললেন – "পরশু রাতেই চেয়েছিলেন খাম দু'টো। গতকালও প্রায় সারাদিন ধরে লিখেছিলেন। তারপর রাতের সিস্টারকে বলেছিলেন যে ওনার বালিশের তলায় খামদু'টো থাকবে, আপনি এলে আপনাকে যেন দিয়ে দেওয়া হয়। ..... শরীর খারাপ লাগছে বলে কিছু বলেননি তখন। কয়েকঘন্টা পরে, ভোরের দিকে নার্স দেখেছে।"

বাপ্পা যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে খামদু'টো নিল, তারপর ঘরের কোণে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়লো।

আজ সকালে ঘুম ভেঙেছে হাসপাতালের ফোনে – "শুচি সেনের হার্ট এ্যাটাক হয়েছে, ICU-তে আছেন। আটচল্লিশ ঘন্টা না কাটলে কিছু বলা যাচ্ছে না।"

ICU-এ থেকে ঘুরে, মায়ের জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে এসে বসেছে বাপ্পা। আধঘন্টা বাদে ডাক্তার কথা বলবেন।

ঘরে এখনো শুচির সব জিনিস ছড়ানো – লেখার প্যাড, কলম, গীতবিতান, লোশন, চশমা, ব্রাশ।

খামগুলোর দিকে একবার তাকালো ও।

একটা বেশ ভারী – ওপরে লেখা "রীতি ব্যানার্জ্জী"।

অন্যটা একটু হাল্কা – ওপরে লেখা "বাপ্পা ব্যানার্জ্জী"। শতদ্রু না লিখে, নিজের দেওয়া "বাপ্পা" নামটাই লিখেছে মা। খামটা খুললো বাপ্পা। মায়ের হাতের লেখার সঙ্গে বাপ্পার পরিচয় ছিলো না আগে – খুলে দেখলো ঈষৎ জড়ানো অক্ষরে বাপ্পাকে লেখা চিঠি।

"বাপ্পা, তোমার সঙ্গে এই ক'মাসে এতো কথা হয়েছে যে তোমার হয়তো মনে হবে "আবার চিঠি কেন"? .....

আসলে, সব কথা বোধহয় মুখে বলা যায় না। কিছু কথার জন্য চিঠির আড়ালই ভালো।

আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, গত ক'দিনে এটা বেশ বুঝতে পারছি। তাই ভাবলাম যে তোমার চিঠিটাও এখনি লিখে ফেলি – কখন ডাক আসে তার তো ঠিক নেই!

রীতির জন্যও একটা চিঠি রেখে গেলাম, তুমি ওকে সময় মতো দিয়ে দিও। ওকে দেওয়ার আগে, তুমি নিজেও পড়ে নিতে পারো একবার। গোপন কিছুই নেই – খোলা চিঠি।

আসলে রীতিকে যত কথা লেখার দরকার হয়েছে আমার, তোমাকে বোধহয় তার কোনোটাই লেখার দরকার নেই। তোমাকে তিরিশ বছর পরে প্রথম যেদিন বিজয়গড়ের বাড়ীতে দেখলাম, সেদিনই বুঝেছিলাম যে তুমি ঈশ্বরের কৃপায় জীবনের গভীর জ্ঞান অতি সহজে লাভ করেছো। বুঝেছিলাম যে তুমি জীবনের বয়ে-যাওয়া আনন্দধারাকে নিজের ভেতরে অনুভব করেছো – তুমি কারুর বিচার করো না, আমারও না। তুমি সবকিছুকে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারো। তুমি অত্যন্ত উদার মনের, সহনশীল মানুষ।

খৃষ্টানরা যেমন গীর্জায় গিয়ে, ফাদারের কাছে "confess" করে, তেমনি করে তোমাকে আমি সব খুলে বলেছি – সুশোভন এবং লাপ্পার কথাও বলেছি ..... তাদের হারানোর কথাও বলেছি। তোমাদের ছেড়ে একদিন চলে গিয়েছিলাম – যাদের নতুন করে আঁকড়ে ধরেছিলাম, তারা একদিন আমায় ছেড়ে চলে গেলো।

জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। আবার ফিরে এলাম, দেখা হলো তোমার সঙ্গে। তুমি আমায় অস্বীকার করলে না। তোমার উদার মনের ছায়ায় তুমি আমাকে আশ্রয় দিলে।

তাই তোমাকে সাহস করে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, এই শ্লোকটা তুমি কখনো শুনেছো?

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরে নিত্যং মহাপাতক নাশনঃ।।

মনে হয়, আগে না শুনে থাকলেও তুমি এর মানেটা বুঝবে।

পূরাণের ঐ পঞ্চকন্যার নাম নিলে মহাপাতক নাশ হয় কিনা আমি জানি না, কিন্তু তাঁদের নাম নিলে যে মহাপাতক হয় না এ' আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

এঁরা কেউ কিন্তু "পতি পরম গতি" একগামিনী so called সাধ্বী পত্নী ছিলেন না। সবাই উচ্চবর্ণেরও নন। অথচ আমাদের হিন্দুধর্মের পূরাণে এঁদেরও জয়গাথা আছে, এঁদের জন্যও জায়গা রাখা আছে।

কিন্তু তবু দেখো – অনেকের মনে সেই জায়গাটুকু থাকে না, অনেকে ঘরের কোণে সেই জায়গাটুকু ছেড়ে দিতে রাজী থাকে না। তার জন্য আজ আর আমার অবশ্য কোনো অভিযোগ নেই।

সাতজন্মের সম্পর্কে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না – একজন্মেই যেখানে সম্পর্ক অটুট থাকছে না, সেখানে সাত জন্ম ধরে সেই সম্পর্কের বোঝা বয়ে চলাটার মধ্যে কোনো যুক্তি আছে কি? কারুর কারুর মধ্যে যদি বা তেমন সম্পর্ক থেকেও থাকে, তোমার বাবার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক আমার ছিলোনা এটা স্বীকার করতে আমার কোনো লজ্জা নেই।

আমি শুধু এইটুকু জানি, যে এই জন্মের সব দেনা-পাওনা মিটিয়েছি বলেই যাওয়ার ডাক এসেছে। পরজন্মের ভার যাঁর হাতে, তিনিই আবার বেঁধে দেবেন আমায় নতুন সম্পর্কের বাঁধনে।

তাই তোমাকে একটা অনুরোধ করে যাই – যে বাড়ীতে তোমার বাবা বেঁচে থাকলে আমায় মোটেই ঢুকতে দিতেন না, সেই বাড়ীতে তুমি আমার দেহাতীত আত্মাকে ডেকে এনো না।

আমার কথা যদি শোনো, তাহলে আমার শ্রাদ্ধ কোরো না। তোমার ভালোবাসার পুজো আমি এই কয়েকমাসে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি – মন্ত্রের পুজো দিয়ে আর কি হবে, বলো?

আমি জানি যে তুমিই আমার জন্য এই কেবিনের ব্যবস্থা করেছো, জানতে পারার পরও তোমার ভালোবাসার দান আমি ফেরাতে পারিনি ..... ফেরাতে চাইনি। তোমার দান ফিরিয়ে দেবো, এতো অহঙ্কার আমার নেই।

তুমি যা করেছো এতদিন ধরে, তাতেই আমার আত্মার তৃপ্তি হবে – মুক্তি হবে কিনা তা জানেন শুধু তিনি, যিনি মুক্তিদাতা। তুমি আর কিছু করার চেষ্টা কোরো না।

তুমি, আমার কষ্ট হবে ভেবে, আমার থেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছো – কিন্তু আমি জানি যে রীতি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না, তোমার শত অনুরোধেও না। ওকে জোর কোরো না, বাধ্য কোরো না আমার জন্য কোনো কাজ করতে।

আমার দেহের সৎকার হয়ে গেলে, তবে ওকে খবর দিও – নাহলে শুধু শুধু রীতির ওপর চাপ পড়বে আসার জন্য, ও মন থেকে আসতে না চাইলেও। তুমি একা আমার হয়ে সংসারের সঙ্গে এতো যুদ্ধ কোরো না বাপ্পা – আমার লজ্জা করে, খারাপ লাগে। যেদিন তোমার মন নিয়ে সংসার মেয়েদের দিকে তাকাবে, সেদিন যুদ্ধটা আর যুদ্ধ থাকবে না – সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করো।

আমার ব্যাঙ্কের টাকা থেকে তুমি আমার সৎকারের ব্যবস্থা কোরো – এটা আমার অনুরোধ নয়, আদেশ।

সব টাকাই এখন একটা এ্যাকাউন্টে আছে, যে এ্যাকাউন্টে তোমার নাম ঢুকিয়েছিলাম কয়েকমাস আগে .... সঙ্গের ভল্টেও তোমার নাম আছে।

তুমি শুধু হিন্দু সৎকার সমিতিকে একটা call করে দিও – ওরাই গাড়ী পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা করে নেবে।

সব কাজ হয়ে গেলে, বাকী টাকা থেকে একদিন অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের খাইও – গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে ফোন করলে ওনারা সব বন্দোবস্ত করে দেবেন।

বাকী যা থাকবে, তা' তোমার আর রীতির সমান সমান। গয়নাগুলোও তাই – রীতি আর আহেলীর সমান সমান। ঐ ভল্টেই আছে সব। রীতি না নিলে, তোমরা যা করার কোরো।

আর কি বলবো, বলো? তুমি ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো।

তোমার মতো মানুষের জীবনটাই বোধহয় তাদের চরিত্রের পুরস্কার – আহেলী আর সাম্যকে দেখে আমি আবার নতুন করে বুঝেছি কথাটা। ওরা তোমাকে ভালো রাখবে, আমি জানি তুমিও ওদের ভালো রাখবে।

তুমি, আমার বা তোমার বাবার চেয়ে অনেক ওপরে। গর্ব হয় তোমাকে দেখে ..... যদিও জানি যে আমার মুখে এ'কথা শোভা পায় না। তুমি যা হয়েছো, তা নিজের গুণে হয়েছো – আমার ছেলে বলে নয়।

রীতির জন্য চিন্তা হয় – ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওর চোখে যেন একদিন জ্ঞানের আলো ফোটে .... ওর মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলছে সে আগুন যেন নিভে যায় .... ও যেন শান্তি পায় .... ও যেন ভালো থাকে।

তুমি আমার জন্য দুঃখ কোরো না – বিশ্বাস করো, আমার জীবনের এই সমাপ্তি আমার জন্য চরম শান্তির প্রতীক। পরম করুণাময় এতদিনে আমাকে এই সমাপ্তির যোগ্য মনে করেছেন বলে আমি সত্যি আনন্দিত।

আমি জানি যে আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিয়েছো, আমার ওপর তোমার কোনো রাগ নেই। তবু নিজের মুখে একবার বলে যাই – তোমাকে ছেড়ে যেতে একদিন বাধ্য হয়েছিলাম, পারলে ক্ষমা করে দিও।

ইতি –

তোমার মা।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে রাখলো বাপ্পা।

তারপর রীতির চিঠিটা বের করলো – মা বাপ্পাকে পড়ার অনুমতি দিয়ে গেছে।

পড়লো বাপ্পা – দীর্ঘ চিঠি, প্রায় পনেরো মিনিট লাগলো পুরোটা পড়তে। কখনো চমকে উঠলো, কখনো চোখের জল চাপলো। বুঝতে পারলো যে অনেকদিন ধরে, অনেক ভেবে চিন্তে, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, কোথাও আড়াল না রেখে, রীতিকে এই চিঠি লিখেছে মা। যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেছে, নিজের জীবনের দলিল খুলে ধরে দেখছে।

বাপ্পাকে লেখা চিঠিটার সঙ্গে এই চিঠিটার অনেক তফাৎ।

ধীরে ধীরে আবার খামে ঢুকিয়ে রাখলো চিঠিটা – কে জানে রীতির কি প্রতিক্রিয়া হবে চিঠিটা পড়ে।

এখনো আধঘন্টা হয়নি, কিন্তু নার্স এসে জানালো যে ডাক্তার অপেক্ষা করছেন ওনার অফিসে।

বাপ্পা দ্রুতপায়ে করিডোর পেরিয়ে ডঃ দত্তর অফিসের দিকে হাঁটা দিলো। বাপ্পাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ দত্ত।

এগিয়ে এসে বাপ্পার কাঁধে হাত রেখে বললেন – "I am sorry .... কিছু করা গেলো না .... এতোদিনের লাগাতার চিকিৎসায় হার্ট তো দুর্বল হয়েই ছিলো ...."

বাপ্পা শুধু বললো – "Can I see her once?"

ডঃ দত্ত বললেন – "নিশ্চয়ই।"

নার্স নিয়ে গেলো বাপ্পাকে একটা ঘরে, ICU থেকে নামিয়ে এনে এখানে রাখা হয়েছে শুচির মৃতদেহ।

গলা অবধি চাদর দিয়ে ঢাকা, চোখ দু'টো বন্ধ।

শীর্ণ, নিষ্প্রাণ মুখে শান্তির ছোঁওয়া ..... অবশেষে।

বাপ্পা হাত বাড়িয়ে কপালটা ছুঁলো একবার, তারপর ঘুরে এসে পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো।

নার্সকে বললো ওকে কিছুটা সময় দিতে – ও কয়েকটা ফোন করবে, তারপর বাকী formalities শেষ করবে।

নার্স বেরিয়ে যেতে বাপ্পা প্রথমে ফোন করলো অফিসে, তারপর আহেলীকে।

একঘন্টার মধ্যেই স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে আহেলী চলে এলো। গৌরীকে ফোন করে বলে এসেছে স্কুলের পর সাম্যকে আজ বাড়ীতেই রাখতে – বাপ্পা আর আহেলীর ফিরতে দেরী হতে পারে।

আহেলী গিয়ে একবার শুচিকে প্রণাম করে এলো। তারপর বললো – "রীতি ..... ?"

বাপ্পা বললো – "মা তো চিঠিতে লিখে গেছেন দাহ হওয়ার পর খবর দিতে ..... সেটা ঠিক হবে কি? বুঝতে পারছিনা। ...."

আহেলী একটু ভেবে নিয়ে বললো – "এক কাজ করো – রীতিকে একটা text পাঠিয়ে খবরটা দাও। তারপর ওর reaction দেখে decision নেওয়া যাবে। ও আসতে চাইলে বডি রেখে দেওয়া হবে, নাহলে হিন্দু সৎকার সমিতিকে ফোন করবো। ..... মা'র শেষ ইচ্ছেগুলো অগ্রাহ্য না করেও তুমি এ'টুকু করতেই পারো – মা'র তোমার decision-এর ওপরে বিশ্বাস ছিলো।"

অনেক ভেবে-চিন্তে বাপ্পা text করলো – "Maa just expired, has been in the hospital. Per her last wish I am going to call HINDU SATKAR SAMITI to cremate her body, as soon as all formalities are over."

প্রায় পাঁচমিনিট হয়ে গেলো, কোনো উত্তর এলো না।

বাপ্পা যখন ধরেই নিয়েছে যে রীতি এই খবরটাও ignore করবে, তখন হঠাৎ screen-এ ভেসে উঠলো text .... রীতি লিখেছে – "Oh ok. BTW, why was she hospitalized?"

বাপ্পা লিখলো – "It's a long story. She had cancer, was diagnosed before I met her about 18 months back. I came to know about it accidentally. She did not allow me to disclose the news to you — she thought that would put pressure on you to come and visit her. She did write a long letter to you and left it with the nurse the night before she died. I'll send it to you within a day or two."

ও প্রান্তে নীরবতা।

বারো মিনিট হয়ে যাওয়ার পর, আহেলী বললো – "She needs time, leave her alone for now ..... আসবে বলে কিছু যখন লিখলো না, বডি রাখার কথাও বললো না, তখন আমার মনে হয় আর দেরী করার দরকার নেই। আমি call গুলো করছি, তুমি hospital-এর অফিসে গিয়ে formalities-গুলো সেরে ফেলো।"

আধঘন্টার মধ্যে সব শেষ করে দু'জনে এলো শুচির জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে।

গীতবিতান, চশমা এবং অন্যান্য পার্সোনাল জিনিস সব গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিলো আহেলী।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবার ঘর পরিষ্কার করবে পরবর্তী পেশেন্টের জন্য।

ওরা এসে বাইরের লাউঞ্জে বসলো – হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ী আসতে এখনো দেরী আছে।

বাপ্পা বললো – "মা তো শ্রাদ্ধ করতে বারণ করেছে .... বাবার অমতে ঐ বাড়ীতে মায়ের আত্মাকেও নাকি আমার ডাকা উচিত না .... কিন্তু সেটা তো হয় না। আমি ছেলে হয়ে মুখাগ্নি করবো না, শ্রাদ্ধ করবো না, এটা আমি মানতে পারছি না। ....."

আহেলী বাপ্পার হাতের ওপর হাত রেখে বললো – "তোমার যা যা করতে ইচ্ছে করছে, সব করো তুমি। মা'র কথা রেখেও তুমি সেগুলো করতে পারো ..... মা একটুও দুঃখ পাবেন না। হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ী আসুক, সঙ্গে আমরাও যাবো। তুমি মুখাগ্নি করবে। বাড়ীতে নাহয় নাই হলো, ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের কাছের মঠে ক্রিয়াকর্ম করা যায় – তুমি সেখানে মা'র শ্রাদ্ধ করবে। .... তোমার যেভাবে মা'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে করে, তুমি সেভাবেই জানাবে।"

বাপ্পার চোখদু'টো হঠাৎ ভরে গেলো জলে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে চেপে ধরলো ও।

আহেলী পাশে বসে রইলো, শক্ত হাতে বাপ্পার হাত ধরে।

সব কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেলো।

গৌরীকে আগেই বলা ছিলো – ও একটা থালায় লোহা, নিমপাতা, আগুন আর মিষ্টির অভাবে চিনি রেখে দরজা খুলে ধরলো।

নীচের কল থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেছিলো বাপ্পা আর আহেলী। এবার এক এক করে জিনিসগুলো ছুঁয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলো।

দু'জনে দুই বাথরুম থেকে স্নান সেরে, ধোওয়া জামাকাপড় পরে, এসে বসলো সাম্যর কাছে।

সাম্য এগিয়ে এসে বাপ্পাকে hug করলো। বললো – "Are you sad, Baba?"

বাপ্পা বললো – "A little ..... how was your school?"

সাম্য বললো – "ভালো। কিন্তু কাল আমি স্কুলে যাবো না, তোমার সঙ্গে থাকবো। মা বলেছে তুমি বাড়ীতে থাকবে।"

বাপ্পা একটু হেসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো।

সাম্য বললো – "ঠাম্মা কেন আমাদের বাড়ীতে এসে থাকলো না, দাদুর মতো?"

বাপ্পা কিছু বলার আগেই, আহেলী বললো – "ঠাম্মাকে যে অনেকদিন নানাকাজে বাইরে থাকতে হয়েছে!"

সাম্য বললো – "বাইরে কোথায়?"

আহেলী বললো – "কানাডা ...."

সাম্য বললো – "কানাডা থেকে এসে?"

আহেলী বললো – "তখন যে ঠাম্মার শরীর খারাপ হয়ে গেলো!"

সাম্য বললো – "আমি তো pray করছিলাম যে ঠাম্মা সেরে উঠে যেন আমাদের বাড়ীতে এসে থাকে, দাদুর মতো আমার সঙ্গে play করে। কিন্তু তাও ঠাম্মা কেন সেরে উঠলো না?"

আহেলী বললো – "ঠাম্মার শরীরে যে অনেক কষ্ট হচ্ছিলো! তোমার prayer শুনলে ঠাম্মাকে আরো অনেকদিন কষ্ট সহ্য করতে হতো, তাই না? সেটা কি ঠিক হতো?"

সাম্য চুপ হয়ে গেলো।

আহেলীর ইঙ্গিতে, গৌরী সাম্যকে নিয়ে গেলো ডিনার টেবিলে।

আহেলী সাম্যর রাতের খাওয়ার যোগাড় করে দিয়ে, বাপ্পার জন্য একগ্লাস লস্যি নিয়ে এলো। সঙ্গে কাটা ফল। নিজের জন্য একগ্লাস ঠাণ্ডা দুধ। লস্যি ওর ভালো লাগে না।

বাপ্পা অন্যমনস্ক ভাবে ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

আহেলী লস্যির গ্লাসটা সামনে ধরে বললো – "শুরু করো।"

বাপ্পা গ্লাসে একচুমুক দিয়ে, একটা আপেলের টুকরো তুলে নিলো।

ফোনের ভয়েস রেকর্ডারে গিয়ে খুঁজতে লাগলো গতবছরের সেই রেকর্ডিংটা।

সেদিন আহেলীকে নিয়ে বিজয়গড়ের বাড়ীতে গিয়েছিলো বাপ্পা।

রবিবারের বিকেল। সাম্যকে বন্ধুর বাড়ীর play-date এ নামিয়ে, ওরা দু'জন শুচির বাড়ী এসেছিলো। আহেলীই চেয়েছিলো দেখা করতে।

শুচিরও ইচ্ছে ছিলো আহেলীকে দেখার, সাম্যকেও – যদিও মুখ ফুটে বলেননি।

মুখ ফুটে ইদানীং আর কিছুই বলতেন না শুচি, কাউকেই না।

সাম্যকে নিয়ে ঐ বাড়ীতে যাওয়া হয়নি, তবে পরে কয়েকবার হসপিটালে নিয়ে গেছে।

বিজয়গড়ের বাড়িতে সেদিন কথায় কথায় শুচির গানের কথা উঠেছিলো।

আহেলী অনুরোধ করেছিলো শুচিকে একটা গান শোনানোর জন্য।

কয়েকবার পীড়াপীড়ি করার পর, শুচি গেয়েছিলেন।

গলা আর আগের মতো নেই, নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারতেন না, তাও শুনিয়েছিলেন দুটো গান।

বাপ্পা ফোনের ভয়েস রেকর্ডারে ধরে রেখেছিলো –

"তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল/সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল। ...." আর "পরবাসী, চলে এসো ঘরে অনুকূল সমীরণ ভ'রে। ....."

মনে হয়েছিলো শুচি যেন "গৃহছাড়া নির্বাসিত" প্রাণের সমস্ত আকুতি দিয়ে পূজো করছেন, নাই বা হোলো গলা নিখুঁত। ঘরের ভেতর, আর বাপ্পার মনের ভেতর, থেকে গিয়েছিলো সেই গানের রেশ – গান শেষ হওয়ার পরেও। যেন কোন্ সুদূর থেকে ভেসে আসা স্মৃতিমধুর পারিজাতের সুবাস .... যা হারানোর নয় .... যা কোনোদিন হারাবে না।

(১৬)

বাপ্পা বাকী সপ্তাহটা ছুটি নিয়েছে।

সোমবার থেকে আবার অফিস যাবে, শুক্রবার পর্যন্ত।

পরের শনিবারে শ্রাদ্ধ, ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের কাছের ধর্মীয় মঠে।

আহেলী এখন ছুটি নেয়নি, ও শ্রাদ্ধের দু'দিন আগে ছুটি নেবে।

শ্রাদ্ধের জায়গাটা বুক করে, টাকা জমা দিয়ে, "শ্রীমতি শুচিদেবীর মাতৃদায়গ্রস্ত পুত্র শতদ্রু (বাপ্পা) ব্যানার্জ্জী'র নামে শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপাতে দিয়ে এলো বাপ্পা – ভেনুর ডিটেইলস্ দিয়ে।

এই শনিবার সকালে কার্ড ডেলিভারি দেবে, পরের শনিবার কাজ।

হয়ে যাবে – কিছু হাতে আর কিছু স্পীডপোস্টে পাঠিয়ে দেবে কার্ড, ফোন তো আছেই।

শুচির কর্মস্থলের লোকজন ছাড়াও, নিজের এবং আহেলীর কর্মস্থলের লোকজন আর কিছু চেনাজানা লোককে আমন্ত্রণ করবে ঠিক করেছে বাপ্পা – যে যে আসতে পারে আসবে, না পারলে আসবে না। কিন্তু ও সবাইকে জানাবে ওর মাতৃদায়ের কথা। মা-কে অনাথিনীর মতো বিদায় দেবে না বাপ্পা।

হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পর, শুচি বাপ্পার কাছে বিজয়গড়ের বাড়ীর চাবি দিয়ে রেখেছিলেন।

সপ্তাহের শেষে একবার বাপ্পা আর আহেলী গিয়ে ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখতো।

আজ আবার সেই বাড়ীতে এলো বাপ্পা।

বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা বললো – এই মাসের শেষে বাড়ী ছেড়ে দেবে।

আসবাবপত্র খুব সামান্যই ছিলো – সেগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। কাজের মেয়েটি চাইলে নিয়ে যেতে পারে কিছু জিনিস। এই weekend-এ আহেলীকে নিয়ে এসে কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে।

শোওয়ার ঘরের টেবিলের ওপর তিনটে ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা।

প্রথমটায় রীতিকে কোলে নিয়ে মা বসে আছে, পাশে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাপ্পা – কল্যাণীর মামাবাড়ীতে তোলা ছবি, দেখে মনে হচ্ছে রীতি তখন মাস তিনেকের হবে।

দ্বিতীয় ছবিটা নিশ্চয়ই সুশোভন সেনের – বাপ্পার স্মৃতিতে আবছা যে মুখটা ধরা আছে কল্যাণীর তুবড়ি বানানোর সঙ্গী হিসাবে, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

তৃতীয় ছবিটা লাপ্পার জন্মদিনের কেক কাটার – বাপ্পার ছোটবেলার মুখের সঙ্গে অদ্ভুত মিল।

আগেও দেখেছে ছবিগুলো – যখন আহেলীকে নিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে এসেছিলো।

আজ আবার ভালো করে দেখলো।

মনের মধ্যে কোনো রাগ বা বিদ্বেষ খুঁজে পেলো না বাপ্পা।

অকালে হারিয়ে যাওয়া লাপ্পার জন্য একটা বিষণ্ন ভালোলাগা, আর তথাকথিত বাঙালী নিয়মের গণ্ডীর বাইরে বেরোনো স্মার্ট সুশোভনকাকুর জন্য একটা কষ্ট-মেশানো সহানুভূতি।

আর মা? মা'র জন্য কোনো অনুভূতিই বোধহয় খুব প্রাঞ্জল ভাবে ধরা দিতে পারেনা বাপ্পার মনের ভুলভুলাইয়াতে। কষ্ট, ভালোবাসা, অভিমান, সহানুভূতি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, শ্রদ্ধা – সব মিলেমিশে একাকার। সেই মিলেমিশে যাওয়া বর্ণালীতেই চিরদিনের জন্য আটকে রইলো বাপ্পার মা, ওর ছোটবেলা আর বড়োবেলাকে একসঙ্গে নিয়ে – আর হারানোর ভয় নেই।

টেবিলের ওপর একটা ডায়েরী রাখা ছিলো, সেটা তুলে নিয়ে খুলে দেখলো বাপ্পা।

পাতার পর পাতা অনেক নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরে ভরা ডায়েরী।

কি ভেবে সেটা সঙ্গে নিয়ে নিলো ও।

এই ক'মাসে মায়ের পুরোনো কিছু বন্ধুর নাম শুনেছে মায়ের কাছে – কল্যাণী, কলকাতা আর বম্বের।

এখান থেকে নাম-ঠিকানা নিয়ে, তাঁদেরও শ্রাদ্ধের কার্ড পাঠাতে হবে।

বাড়ী আসতে আসতে বিকেল হয়ে গেলো বাপ্পার।

সাম্য গৌরীর সঙ্গে নীচের মাঠে নামার তোড়জোড় করছে, আহেলী এখনও ফেরেনি।

সোফায় এসে বসলো বাপ্পা, গৌরী একগ্লাস জল দিয়ে গেলো।

সারাদিনের ছুটোছুটিতে ক্লান্ত লাগছে, তবে অনেকগুলো কাজও হয়ে গেছে।

একটি মৃত্যুর পর এতো কাজ থাকে যে শোকের অবকাশ থাকে না।

হয়তো সেটাই উদ্দেশ্য – নিয়ম-আচারের ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে শোককে সহজ করে আনা। .....

আহেলী ফিরলে কাজের লিস্টটা নিয়ে বসলো দু'জনে। যে কাজগুলো হয়ে গেছে সেখানে টিক দিলো।

নিমন্ত্রিতদের একটা লিস্ট বানাতে হবে – বাপ্পা সেটা করবে কাল দিনের বেলায়, মা'র ডায়েরী ঘেঁটে আর নিজেদের চেনা লোকজনদের নামের তালিকা বানিয়ে।

বাপ্পা বললো – "খাবারের কি ব্যবস্থা করবে?"

আহেলী বললো – "শুকনো প্যাকেটের খাবার করো, সুবিধে হবে। বাইরে তো! তাছাড়া এমনিতেও শ্রাদ্ধবাড়ীতে বাঙালীরা বেশীর ভাগই কিছু খায়না। ..... চপ, রাধাবল্লভী, আলুর দম, মিষ্টি এইসব রাখো। বেশী থাকলেও নষ্ট হবে না – পরে আস্তে আস্তে জলখাবারে খেয়ে নেওয়া যাবে।"

পরেরদিন সকালে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলো বাপ্পা।

পাসবই আপডেট করে, টাকাপত্রের হিসেব বুঝে, মা'র সঙ্গের joint অ্যাকাউন্টটা close করে দিলো।

তারপর গেলো মা'র ভল্টে, সব বের করে ভল্টও বন্ধ করে দেবে।

বাপ্পা কোনদিন জানতোই না মা'র কি গয়না আছে না আছে। মা'ই ওকে সব বলেছিলো কয়েকদিন আগে।

বেশীরভাগ গয়না মা বাড়ীতেই রেখে গিয়েছিলো বাড়ী ছাড়ার সময় – কতই বা আর গয়না থাকে মধ্যবিত্ত বাড়ীর মেয়ে বা বৌয়ের? মায়ের মুখ দেখে দেওয়া ঠাকুমার সীতাহার, শ্বশুরবাড়ী থেকে আশীর্বাদে দেওয়া গলার চিক, মায়ের বাবার দেওয়া বিয়ের সময়ের ঝুমকো, চূড়, গলার হার – এছাড়া ছিলো বিয়ের সময়ে আত্মীয়স্বজনদের থেকে পাওয়া ছোটখাটো আরো কিছু গয়না। সবই পড়েছিলো ঠাকুমার ভল্টে, মা নেওয়ার কথা ভাবেওনি। বাপ্পার মনে পড়লো যে সেই সীতাহার দিয়েই পরে আহেলীর মুখ দেখেছিলেন বাবা, চূড়জোড়া দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

গায়ে যা পরা ছিলো, সেগুলো মা'র মায়ের গয়না – রীতি হওয়ার সময়ে সাধে দেওয়া কানফুল, বিয়ের সময়ে দেওয়া চারটে চুড়ি আর বাপ্পা হওয়ার সময়ে সাধে দেওয়া গলার একটা সরু চেন। সেগুলোই মা'র সঙ্গে থেকে গিয়েছিলো। এছাড়া, বম্বেতে রেজিস্ট্রেশনের সময়ে সুশোভনকাকুর দেওয়া কিছু গয়না। একটা নবরত্নের জড়োয়া সেট, আর একটা মুক্তোর সেট।

সব বের করে, সঙ্গের এ্যাটাচি কেসে ভরে বাইরে এলো বাপ্পা। আপাতত বাড়ীতে নিয়ে যাবে, দিন দুয়েকের মধ্যই আহেলীর ভল্টে তুলে দিতে হবে – বাড়ীতে গয়না না রাখাই ভালো।

রাত্রে আহেলীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বাপ্পা বললো – "রীতিকে তো গয়নার কথা জিজ্ঞেস করলেই রেগে যাবে, কিন্তু মেয়ে হিসাবে টাকা-গয়না সবেতেই ওর কিছু প্রাপ্য আছে। মা বলেও গেছে সেকথা।"

আহেলী বললো – "চিন্তা কোরো না। সব একটু ঠাণ্ডা হলে, আমি কথা বলবো ওর সঙ্গে। রীতি আসবে তো কলকাতায় একবার!"

বাপ্পা বললো – "আসা তো উচিত, কিন্তু কবে আসবে তার কোনো ঠিক নেই। ..... ওহো, ওকে দেওয়া মা'র চিঠিটাও তো রয়ে গেছে – তালেগোলে পাঠাতেই ভুলে গেছি। কোথায় আছে ওটা?"

আহেলী বললো – "আমার ব্যাগের মধ্যেই আছে – আমায় পড়তে দিলে না তুমি? ..... চিঠিটা কিন্তু সত্যি অসাধারণ – I just hope Riti does justice to the letter and it's content ..... শনিবার শ্রাদ্ধের কার্ড ডেলিভারি নেওয়ার পর চিঠিটা পাঠিও, সঙ্গে একটা কার্ডও পাঠিয়ে দিও .... overnight courier করো।"

বাপ্পা বললো – "হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে। শ্রাদ্ধের কার্ডটাও পাঠানো দরকার।"

আহেলী হাত বাড়িয়ে বেডল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো।

বাপ্পাকে বললো – "শুয়ে পড়ো এবার। কাল হবে বাকী সব।"

– "বাপ-পাআ ..... বাপ-পাআ ....."

– "উঁম্ ....."

– "এসো এদিকে .... দেখো কি বানিয়েছি।"

– "উঁম্ ....."

– "না উঠলে পাবে না কিন্তু ...."

– "কী? ....."

– "এসে দেখো। ...."

– "তুঁমি বঁলো না। ...."

– "হালুয়া!"

– "সত্যি?"

– "সত্যি!"

বাপ্পা ছুটে এলো। .....

কোথায়? কোথায় মা? কোথায় হালুয়া? .....

ছুটতে ছুটতে বাপ্পা কতদূর চলে এলো ..... অন্ধকারে কিছু ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না ..... তাও ছুটছে বাপ্পা .... দূরে নীল জলের কাছে আবছা কাকে দেখা যাচ্ছে ..... ও কি মা?

ছুটতে গিয়ে এবার বাপ্পার পা থেকে জুতো খুলে গেলো – বাপ্পা তাহলে দৌড়বে কি করে? .....

– "মা, দাঁড়াও একটু ..... একটু দাঁড়াও .... জুতোটা ...."

– "আমাকে যে যেতেই হবে বাপ্পা ..... কি করে দাঁড়াই বলো?"

– "জুতোর ফিতেটা ....."

– "এখনো শেখোনি ফিতে বাঁধতে? .... শিখে নাও তাড়াতাড়ি, বোনকে শেখাতে হবে তো!"

– "মা, মাগো ..... তুমি হারিয়ে যেও না মা ....."

– "আমি তো হারাইনি বাপ্পা ..... আমি আছি .... থাকবো সবসময় .... তুমি চোখ বন্ধ করে ঠিক এইখানে চলে এলেই আমাকে দেখতে পাবে। .... এখন যাই?!"

– "মা ...."

বুকের কাছে একটা চাপা কষ্ট নিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেলো বাপ্পার।

সবে ভোরের আলো ফুটছে, জানলার ফাঁকে তার আবছা আভাস।

এত জীবন্ত স্বপ্ন বাপ্পা কোনদিন দেখেনি।.....

তবে কি সত্যি আত্মা আছে?

সত্যি কি আত্মা কিছুদিন ঘুরে বেড়ায় প্রিয়জনদের কাছাকাছি?

তাদের সান্ত্বনা দেয়, নিজের মায়া কাটায়, তারপর চলে যায় অজানা পথে?

শনিবার সকালে গৌরীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে, বাপ্পা আর আহেলী বেড়িয়ে পড়লো।

বেরোনোর আগে একটু সেদ্ধ-ভাত খেয়ে নিয়েছে।

অনেক কাজ আজকে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

বাপ্পা আজ গাড়ী চালাবে – ড্রাইভারের ছুটি।

সাম্যকে আজ ঘরেই খেলতে বলে গেছে আহেলী।

পাশের ফ্ল্যাটের বন্ধু শুভম খেলতে আসবে – ওর মা'র সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে আহেলী।

পাস্তা রান্না করা আছে, গৌরী গরম করে দেবে দুজনকে – নিজেও খেয়ে নেবে।

ব্যাঙ্কের কাজগুলো আগে সারতে হবে – ব্যাঙ্কে আজ হাফ-ডে।

প্রথমেই আহেলীর ভল্টে গেলো দু'জনে – শুচির গয়না সব তুলে রাখলো ভল্টে।

অন্য ব্যাঙ্কের টাকাটা ডিমান্ড ড্রাফটে তুলে এনেছিলো বাপ্পা, সেটা এখানে জমা করে দিলো। পাসবইটা থাকলো নিজের কাছে, হিসেব রাখার জন্য।

সেখান থেকে এলো শ্রাদ্ধের কার্ড ডেলিভারি নিতে।

বানান, ঠিকানা সব একবার দেখে নিলো আহেলী – ঠিকই আছে সব।

নিমন্ত্রিতদের ঠিকানা লেখা কাগজটা সঙ্গেই ছিলো।

গাড়ীতে বসেই দু'জনে চটপট ঠিকানাগুলো লিখে ফেললো খামের ওপর।

তারপর পোস্ট-অফিস।

গন্ধগ্রীণের প্রতিবেশী ছাড়া, আর সবাইকেই পোস্টে পাঠাবে কার্ড।

আরো আধঘন্টা লেগে গেলো সব কার্ড পোস্ট করে বেরোতে বেরোতে।

এরপর ক্যুরিয়রের কাছে – রীতির চিঠি এবং শ্রাদ্ধের কার্ড পাঠাতে হবে ব্যাঙ্গালোরের ঠিকানায়।

শুচি যদিও "খোলা চিঠি" বলে খামের মুখ এঁটে দ্যাননি, বাপ্পা এখন খামের মুখটা বন্ধ করে দিলো ভালো করে। কি যেন ভেবে, বাপ্পাকে লেখা মা'র চিঠিটার একটা ফটোকপি করলো; ব্যাঙ্কের টাকা আর যাবতীয় গয়নার হিসেবটা লিখলো একটা কাগজে – তারপর সেই দু'টোকেই ভরে দিলো একটা খামে। শ্রাদ্ধের কার্ডের ওপর রাজ আর রীতির নাম লিখলো। তারপর একটা বড়ো এনভেলাপ নিয়ে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো তিনটে চিঠি – ওপরে লিখে দিলো রীতির নাম ও ব্যাঙ্গালোরের ঠিকানা।

ট্র্যাকিং নাম্বারটা নিয়ে রীতিকে পাঠিয়ে দিলো।

ওভারনাইট ক্যুরিয়র, কালই পৌঁছে যাওয়ার কথা। নাহলে বড়জোর সোমবার।

এবার যেতে হবে বিজয়গড়ের বাড়ীতে।

শুচির কাজের মেয়ে শিবানীকে আসতে বলা হয়েছে দুপুরে।

তার পরে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফার্নিচারের দোকান থেকে একজন আসবে ফার্নিচারগুলো দেখতে।

আহেলী সঙ্গে একটা ব্যাগ আর স্যুটকেস নিয়ে এসেছিলো।

শুচির ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র, ভালো শাড়ী, ছবি – এগুলো আহেলী ঢুকিয়ে নিলো স্যুটকেসে।

কিছু বই রাখা ছিলো বুকশেল্ফে, বাপ্পা সেগুলো ভরে নিলো ব্যাগে।

এই করতে করতেই দরজায় বেল বেজে উঠলো – নিশ্চয়ই শিবানী।

দরজা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে এলো আহেলী।

বাইরের ঘরে এসে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শিবানী।

আহেলী ওর পিঠে হাত রেখে সোফায় বসতে বললো। একগ্লাস জল এনে দিলো।

জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিজেকে শান্ত করলো শিবানী।

তারপর চোখ মুছে বললো – "মাসীমা খুব ভালোবাসতেন আমায়। যা রান্না করতাম, তার থেকে একটু দিয়ে দিতেন আমায় বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য। .... এতো যে শরীর খারাপ, একদিনের জন্যে রাগ করতেন না। গেলবারে মেয়েকে কলেজে ভর্তি করার সময় যেচে আমার হাতে টাকা গুঁজে দিলেন, বললেন "মেয়েকে পড়াও, এখনই বিয়ে দিয়ো না"। .... মানুষটা কথা কম বলতেন, একটু অন্যরকম ছিলেন। কিন্তু এতো বাড়ী কাজ করি, অমন মানুষ আর দেখিনি।"

বাপ্পা চুপ করে রইলো – কত সহজ আর আন্তরিকভাবে শিবানী ব্যক্ত করলো ওর অনুভূতি।

কৈ, বাপ্পা তো পারে না এমন করতে!

বাপ্পা শুধু বুকের মধ্যে একটা বোঝা নিয়ে ঘুরছে – হয়তো বোঝাটা নেমে যেতো, যদি বাপ্পাও শিবানীর মতো করে কেঁদে উঠতে পারতো। যদি বাপ্পাও শিবানীর মতো করে বলতে পারতো – "মানুষটা একটু অন্যরকম ছিলেন .... কিন্তু আমায় বড়ো ভালবাসতেন .... পৃথিবী ঘুরে বেড়াই কিন্তু এমন মানুষ আর দেখিনি।"

আহেলী শিবানীকে শুচির ঘরে পরার কাপড়, হাউসকোট, শাড়ী, ব্লাউজ সব দিয়ে দিলো।

বললো যে, শিবানী চাইলে বাসন আর ফার্নিচারও নিতে পারে।

শিবানী বাসনগুলো সবই নিয়ে যাবে বললো, আর নেবে আলনা আর আলমারিটা।

কথা রইলো যে মাসের শেষে, ২৮ তারিখ রবিবার আছে – সেদিন একটা ঠ্যালা এনে, সব নিয়ে যাবে শিবানী। বিছানার চাদর-বালিশও নেবে। তবে খাটটা নেবে না, ওর ঘরে রাখার জায়গা নেই।

সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ফার্নিচারের দোকান খাটটা, পড়ার টেবিল, বুকশেল্ফ, শো-কেস আর সোফা নিয়ে নিলো।

ওরা এ্যাডভান্স টাকা দিয়ে, রিসিটে সই করিয়ে নিলো।

কথা হলো যে ফার্নিচারের দোকান থেকে লোক আসবে ২৮ তারিখে – সকাল ন'টায় এসে লরিতে করে সব নিয়ে যাবে।

শিবানী আসবে বেলা বারোটায়।

সেদিন সকাল থেকেই এখানে চলে আসতে হবে বাপ্পাকে।

সন্ধ্যে ছটায় ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলো দু'জনে।

আহেলীর এক সহকর্মী একজন ক্যাটারারের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছেন – ওরাই সব খাবার দেবে কাজের দিন। ড্রাইভার রাজু লেকমার্কেট থেকে ফুল আর মালা নিয়ে আসবে ভোরবেলা।

সকাল দশটায় কাজ শুরু হবে, চলবে ঘন্টা দুই-তিন। বিকেল চারটে পর্যন্ত থাকবে ওরা এখানে। তার মধ্যেই যাঁরা যাঁরা আসার আসবেন।

শুচির একটা ছবি বাঁধাতে হবে।

বাপ্পা অনেক খুঁজে একটা পুরোনো অ্যালবাম বার করেছে।

নীল-শাড়ী পরা, আলো ঝলকানো, বাপ্পার সেই মায়ের একটা ছবি আছে ওখানে।

স্টুডিও বলেছে যে দরকার মতো edit বা restore করে, ওরা বড়ো করে বাঁধিয়ে দেবে। খুব বড়ো নয়, মাঝারি সাইজের হলেই হবে।

কাজের দু'দিন আগে, ছবির ডেলিভারি নিতে এলো আহেলী।

কাজটা সত্যিই ভালো করেছে ওরা।

বোঝাই যাচ্ছে না যে এতোদিনের পুরোনো ছবি।

শুচির উজ্জ্বল মুখশ্রী ঝলমল করছে ছবিতে।

বাপ্পা অফিস থেকে ফিরে, ছবি দেখে খুব খুশী।

যেন এতক্ষণে ফিরে পেয়েছে আসল মা'কে।

সেই নীল শাড়ী পরা, সবার চেয়ে সুন্দর, নুডলস বানানো, হোমওয়ার্ক করানো, জলতরঙ্গের সুরে গান গাওয়া, স্মার্ট, বাপ্পার মা ....!

শুধুই বাপ্পার মা – আর কেউ নয়, আর কারুর নয় ....!

সাম্য বললো – "Thamma looks so nice here!"

বাপ্পা ছোটবেলার মতো গর্বিতমুখে বললো – "My mother was very pretty, you know!"

আহেলী হাসলো।

রাতে শুতে যাওয়ার ঠিক আগে রীতির মেসেজ এলো বাপ্পার ফোনে – "Received the packet on time. Sorry, forgot to text you earlier."

বাপ্পা লিখলো – "Okay, no worries."

ও আগেই ট্র্যাক করে দেখে নিয়েছিলো যে ডেলিভারি হয়ে গেছে।

আহেলী বললো – "আসবে কিনা কিছু লিখেছে?"

বাপ্পা বললো – "না। ..... দরকার নেই আর কিছু বলার বা জিজ্ঞেস করার। দেখা যাক ও কি করে। ছোট থেকেই ওকে কিছু বললে উল্টো ফল হয়, তাই কিছু না বলাই ভালো।"

আহেলী আর কথা বাড়ালো না।

শনিবার সকাল নটার মধ্যে মঠে পৌঁছে গেলো বাপ্পা, আহেলী, সাম্য, গৌরী আর রাজু।

শুচির ছবিটা রেখে, মালা পরিয়ে দিলো আহেলী। ফুল সাজিয়ে দিলো চারদিকে। ধূপ জ্বেলে দিলো।

বাপ্পা তৈরী হয়ে এসে বসলো আসনে। সাম্য আর আহেলীরও একটু কাজ থাকবে, ওরাও বসলো পাশে।

বাপ্পার এক জুনিয়র কলিগ, শ্যামল, এসে গেছে সাড়ে নটার মধ্যে। ও তদারকি করছে সব।

গৌরীকে আর রাজুকে বলা রইলো অতিথিদের এনে বসাতে। সবাইকে কোল্ড ড্রিংকস্ দিতে। কেউ মাঝে চলে যেতে চাইলে, খাবারের প্যাকেট এনে দিতে। গৌরীকে বলা আছে যে ও আর রাজুও যেন বারোটার সময়ে খেয়ে নেয়, যাতে পরে লোক এলে তাদের সার্ভ করতে পারে।

ক্যাটারার খাবার নিয়ে আসবে সাড়ে-দশটা এগারোটায় – শ্যামলকে টাকা দেওয়া আছে, ও দেখে নেবে। কাজ শুরু হলে বাপ্পা আর উঠতে পারবে না।

ঘড়ির কাঁটা মেনে, ঠিক দশটায় শুরু হলো কাজ।

কতো যে মন্ত্র!

বাপ্পা এইসব সংস্কৃত মন্ত্রের মানেও জানে না। কিন্তু বাপ্পা মানে না জানলেও, এইসব মন্ত্রের নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মানে আছে – নাহলে এরা এতদিন টিঁকে থাকতে পারতো না। শুধু এই বিশ্বাসেই ও মায়ের শ্রাদ্ধ করছে, বাবারও করেছিলো।

বাপ্পা একের পর এক মন্ত্র উচ্চারণ করে যেতে লাগলো, মা'র বিদেহী আত্মার জন্য খাবার সাজাতে লাগলো, আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো যে মা যেন এবারে সত্যি শান্তি পায়।

সাম্য আর আহেলীর কাজ শেষ হতে বেশীক্ষণ লাগলো না।

তারপর ওরা উঠে এসে সামনের সারিতে বসলো। বাপ্পার কাজ চলতে লাগলো।

একটু একটু করে অতিথিরা আসছেন, পেছনে বসছেন।

শ্যামল, গৌরী আর রাজু সবাইকে নিয়ে এসে বসাচ্ছে।

আহেলী আর উঠছে না, পেছনে তাকিয়েও দেখছে না – পরে কথা বলবে অতিথিদের সঙ্গে, কাজ শেষ হলে। ওর নজর আপাতত বাপ্পার দিকে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে বাপ্পাকে, একমনে মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে মা'র ছবির দিকে তাকাচ্ছে।

ঠিক বেলা একটা বেজে দশ মিনিটে শেষ হলো বাপ্পার কাজ।

আহেলী উঠে দাঁড়িয়ে গৌরীর খোঁজে পেছনে তাকালো – বাপ্পার খাবার দিতে হবে। গৌরীকে বলা আছে তৈরী করে রাখতে। সাম্যরটাও .... ও যদিও সকালে একটু দুধ আর একটা কলা খেয়ে এসেছে।

গৌরী এগিয়ে এলো খাবার হাতে নিয়ে।

বাপ্পা আর সাম্যর হাতে প্যাকেটদুটো তুলে দিয়ে আহেলী বললো – "তোমরা আগে খেয়ে নাও। তারপর সবার সঙ্গে কথা বোলো।"

বাপ্পা বললো – "তুমি? তোমারও তো খাওয়া হয়নি!"

আহেলী বললো – "আমিও নিচ্ছি। .... তোমরা শুরু করো, আমি একবার সবার সঙ্গে কথা বলে আসি, তারপর নেবো। সবাই খাবার পেলেন কিনা সেটাও দেখে আসি।"

নয় নয় করেও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক এসেছেন। সত্তর জনের মতো খাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছিলো।

আন্দাজে খুব একটা ভুল হয়নি।

আহেলীর মা এগিয়ে এলেন ওকে দেখে। বাপের বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে কথা বলে আহেলী এগিয়ে গেলো, মা'কে বললো সাম্যকে নিয়ে এসে পাশে বসিয়ে খাওয়াতে।

বাপ্পার অফিসের লোকেরা এগিয়ে গিয়ে কথা বলছে বাপ্পার সঙ্গে, রাজু সবার হাতেই খাবারের প্যাকেট দিয়ে দিয়েছে। আহেলী ওর সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বললো কিছুক্ষণ, তারপর ভিড় পেরিয়ে পেছনে গেলো – যেখানে গল্পগ্রীণের প্রতিবেশীরা আর মায়ের কল্যাণীর বন্ধু দীপামাসী বসে আছে।

দু'পা এগিয়েই অবাক। একদম শেষ সারিতে বসে আছে রীতি, সঙ্গে রাজ।

হঠাৎ দেখে রীতিকে চিনতে পারেনি আহেলী ..... হয়তো আশা করেনি বলেই – রাজকে দেখেই নিশ্চিত হলো। রীতির চোখে আর্দ্ধেক-মুখ-ঢাকা সানগ্লাস, সাদা চুড়িদার কুর্তা পরা, চুল উঁচু করে তুলে বাঁধা। রাজের পরণে সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট।

আহেলী ঘুরে তাকালো বাপ্পার দিকে, ও বোধহয় দেখতেই পাচ্ছে না রাজ আর রীতিকে।

আহেলী এগিয়ে আসতেই রাজের সঙ্গে চোখাচোখি হোলো। হেসে "হ্যালো" বললো আহেলী, তারপর হাতের ইঙ্গিতে একমিনিট অপেক্ষা করতে বলে আহেলী থামলো। প্রতিবেশীদের পেরিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখায় না – ওদের সঙ্গে একটু কথা বললো, সবাই খাবার আর ড্রিংকস্ পেয়েছে কিনা খোঁজ নিলো।

তারপর দীপামাসীর সামনে এসে দাঁড়ালো। একদিন দেখা হয়েছিলো ওনার সঙ্গে, হাসপাতালে।

দীপামাসী মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

বললেন – "কতদিনের সম্পর্ক শুচির সঙ্গে ..... সেই ফ্রক-পরা বয়স থেকে ..... বাবা বদলি হয়ে এসেছিলেন কল্যাণীতে .... শুচি আমার নতুন শহরের প্রথম বন্ধু ছিলো। .... একটু emotional .... ক্ষ্যাপাটে .... তেজী .... কিন্তু সোনা দিয়ে বাঁধানো মন। কোনো ছোট কাজ কখনো করতো না শুচি। .... সুখে-দুঃখে এতোগুলো বছর .... এখনও ভাবতে পারছি না যে সত্যিই শুচি আর নেই।"

আহেলী একবার আড়চোখে রীতির দিকে তাকালো।

ঠিক পেছনেই বসে আছে রীতি, আহেলী নিশ্চিত যে নিজের ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সব কথাই কানে যাচ্ছে ওর।

আহেলী বললো – "খেয়েছেন, দীপামাসী?"

দীপামাসী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন – "হ্যাঁ। .... এবারে উঠবো, অনেকটা পথ যেতে হবে।"

ওনাকে গাড়ী অবধি এগিয়ে দিতে গেলো আহেলী। যাওয়ার পথে গৌরীকে ডেকে বলে দিলো তিনটে খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসতে, আর বাপ্পাকে ডেকে দিতে – যেখানে রীতিরা বসেছে, ওখানে।

আহেলী ফিরে এসে দেখলো রাজ আর রীতি খাচ্ছে, আহেলীর খাবারের প্যাকেটটা পাশে রাখা।

বাপ্পা কথা বলছে ওদের সঙ্গে।

রাজ ডিটেইলসে জিজ্ঞেস করছে সব – কখন হোলো, কতদিন ধরে critical .... ইত্যাদি।

বাপ্পা বলে যাচ্ছে একই কথা, যা আজ সারাদিন ধরে সবাইকে বলছে।

আহেলী নিজের খাবারটা নিয়ে রীতির পাশে এসে বসলো, রীতিকে একটা ছোট্ট যঁম দিয়ে বললো – "ক'দিন আছিস তো?"

রীতি বললো – "আছি, কাল পর্যন্ত। কাল বিকেলের ফ্লাইট। .... মাস্টার কোথায়?"

আহেলী বললো – "সাম্যকে মা'র কাছে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। .... দাঁড়া, ডেকে আনছি। পিপি এসেছে শুনলে ছুটে চলে আসবে।"

রীতি বললো – "তুমি বসো, খাও। আমি যাচ্ছি, মাসীমা-মেসোমশাইয়ের সঙ্গেও কথা বলে আসি একবার।"

আহেলী বললো – "যা .... সামনে আছে, দ্যাখ।"

রীতি এগিয়ে যেতে আহেলী রাজের দিকে ঘুরলো – "How are you, Raj? সব ঠিকঠাক?"

রাজ হেসে বললো – "ব্যস্, সব ঠিকঠাক ভাবী .... আপ শুনাইয়ে!"

আহেলী বললো – "Hope Riti is fine .... ?"

রাজ বললো – "হ্যাঁ, ঠিক হ্যায় আভি। পহলে থোড়ি সি আপসেট থী .... আভি ঠিক হ্যায়।"

বাপ্পা বললো – "ইয়ে আচ্ছা কিয়া, তুম্ সাথ মে আ গ্যয়া। Thanks Raj ...."

রাজ বললো – "Thanks বোলনে কা কোই বাত নেহী .... আপ তো জানতে হ্যায় রীতি কো .... very emotional .... থোড়ি সি immature .... but দিল কি আচ্ছি .... she just needs emotional support once in a while .... otherwise she is very strong."

বাপ্পা হাসলো। ওর চেয়ে ভাল আর কে জানে সেটা? ....

রীতি lucky যে রাজের মতো partner পেয়েছে – যে ওকে বোঝে।

সব wrap up করে বেরোতে বেরোতে পাঁচটা বেজে গেলো।

শুচির ছবি, extra খাবার, ফুল, সব নিয়ে গাড়ীতে তুললো রাজু আর গৌরী।

একটা গাড়ীতে হবে না।

বাপ্পা আর রাজ একটা ট্যাক্সি নিলো, রীতি চলে এলো আহেলীদের সঙ্গে গাড়ীতে।

আহেলীর মা-বাবাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে, আহেলী ফিরে এলো – রাজু গাড়ী স্টার্ট করলো।

অনেকদিন পর পিপিকে পেয়ে, সাম্য মনের সুখে কথা বলে যাচ্ছে। পাশাপাশি বসেছে দু'জনে।

আহেলীর মনে হলো রীতিও যেন একটু আড়াল খুঁজছে, তাই আহেলীর বদলে সাম্যর সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছে। তাই করুক – সময় হলে নিজেই কথা বলবে রীতি।

আহেলী ঝুঁকে পড়ে, সামনের সীটে বসা গৌরীকে জিজ্ঞেস করলো – "ক'টা খাবারের প্যাকেট বেঁচেছে?"

গৌরী জানালো যে ২০টা খাবারের প্যাকেট আছে, অল্প কিছু কোল্ড ড্রিংকসের বোতল।

কোল্ড ড্রিংকসটা সবাই বেশী নিয়েছে, খাবার অনেকে খায়নি।

বাড়ীতে সব জিনিসপত্র তুলে দিয়ে, রাজু চলে গেলো।

ওর বাড়ীর জন্য পাঁচটা খাবারের প্যাকেট আর পাঁচটা কোল্ড ড্রিংকসের বোতল দিয়ে দিলো আহেলী।

গৌরীকে বললো রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলো দু'টো ফ্লাওয়ারভাসে ভাগ করে, বাইরের ঘরের কোণার কাশ্মিরী টেবিল দু'টোয় রেখে দিতে।

বাপ্পা সাম্যকে নিয়ে গেলো স্নান করাতে, তারপর নিজেও আরেকবার স্নান করবে।

শুচির ছবিটা সঙ্গে নিয়ে গেলো বাপ্পা, ওদের বেডরুমের দেওয়ালে ঝোলাবে – দু'দিন আগেই হুক লাগিয়ে রেখেছে ও। ডাইনিং টেবিলের ওপরে রাখা বাবার বিরাট ছবির পাশে জায়গা নাই বা হোলো, বাপ্পা-আহেলীর বেডরুমে মায়ের মাঝারি সাইজের ছবিটা দিব্যি ফিট করে যাবে।

রাজ আর রীতিকেও ফ্রেশ হয়ে নিতে বললো আহেলী।

ওরা backpack দুটো নিয়ে, ওদের ঘরে চলে গেলো।

আহেলী আর গৌরী দু'জনে এবারে খাবারের প্যাকেটগুলো খুলে, সব ভাগ ভাগ করে রাখতে শুরু করলো।

আহেলী রাধাবল্লভীগুলোকে পাঁচটা পাঁচটা করে ফয়েলে মুড়ে crisper-এ ঢুকিয়ে রাখলো।

গৌরীকে বললো দু'রকমের মিষ্টি আলাদা আলাদা দু'টো food-saver-এ রাখতে।

দশটা মতো চপ বাইরে রেখে, বাকী সব চপ freeze করে দিলো।

আলুর দমটা একটা বড়ো bowl-এ ঢাললো – এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, নাহলে খারাপ হয়ে যাবে।

আজ আর কেউ এটা খাবে না, কাল বের করতে হবে।

আহেলী গৌরীকে বললো ওর বাথরুমে গিয়ে এবারে স্নান করে নিতে।

আহেলী ততক্ষণে ভাত চাপিয়ে, পাতলা একটা মুগের ডাল করে নিচ্ছে।

বাপ্পা বেরোলে, আহেলী স্নান করতে যাবে।

গৌরী যেন তখন একটু আলুভাজা আর একটা পাঁচমিশালী তরকারী বানিয়ে ফেলে।

রাতে সবাই হাল্কা খাবে।

স্নান সেরে, ঠাণ্ডা হয়ে, কোল্ড ড্রিংকসের বোতল নিয়ে সবাই বাইরের ঘরে এসে বসলো।

সাম্য চোখ মুছছে – ওর ঘুম এসে গেছে।

গৌরী ওকে নিয়ে গেলো, ভাত খেয়ে শুয়ে পড়বে।

আহেলী গৌরীকেও বললো খেয়ে শুয়ে পড়তে – সারাদিন অনেক খাটনি গেছে।

বাকীরা সবাই একটু পড়ে খাবে – আহেলী একাই করে নিতে পারবে, তাছাড়া রীতিও আছে।

সাম্যকে বিছানায় শুইয়ে, আহেলী আবার এসে বসলো বাইরের ঘরে।

রীতি আর রাজ নীচুগলায় কিছু কথা বলছে।

একমিনিট চুপ করে থেকে, একটু ইতস্তত করে, রীতি বললো – "We have an announcement to make."

বাপ্পা বললো – "What is it? Go ahead ...."

রীতি বললো – "We are getting married .... Raj and I."

বাপ্পা একটু চমকে গেলেও, এক মিনিটে নিজেকে সামলে নিয়ে হাত বাড়ালো – "Congratulations! Congratulations to both of you!"

রীতি বললো – "We have just decided this week .... this may not be the right time to talk about it but ... we thought we might as well make it known to you all."

আহেলী এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বললো – "Sure, why not? This is the right time, in fact this is the perfect time .... congrats .... I am so happy for you, Riti .... and Raj."

রাজ হাসতে হাসতে বললো – "একদম্ সহি বোলা আপনে ভাবী। ইয়ে হি সহি টাইম হ্যায় .... before Riti changes her mind."

সবাই হেসে উঠলো।

রীতি বললো – "আমরা ক'দিন ছুটি নিয়েছি। কাল বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লী যাচ্ছি, রাজের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে খবরটা দেবো। Monday ওখানে থেকে, Tuesday কো হমলোগ মানালি যা রহা হ্যায়। উধারসে back to Delhi on Friday night, and then return flight to Bangalore on Saturday."

আহেলী বললো – "ক্যায়া রাজ ভাইয়া? শাদী সে পহলে হনিমুন?"

আবার হেসে উঠলো সবাই।

খেতে খেতে চললো গল্প।

রীতি আর রাজ ব্যাঙ্গালোরে একটা এনগেজমেন্ট পার্টি করতে চায়, মাস তিনেকের মধ্যে।

বিয়ে হবে পরের বছর।

রাজের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলার পর, দিন final হবে। বিয়ের venue-ও তারপর ঠিক হবে।

রাজ আর রীতি বারবার করে বললো যে বিয়ের কথা পরে, কিন্তু আপাতত সবাইকে যেতে হবে ব্যাঙ্গালোরে – এনগেজমেন্ট পার্টিতে।

ওরা একটা বড়ো বাড়ী কিনছে সামনের মাসে – থাকার কোনো অসুবিধে হবে না।

আহেলী বললো – "লাইট কালারের একটা সব্যসাচী লেহঙ্গা নিবি এনগেজমেন্টের জন্য, সঙ্গে মায়ের নবরত্নের জড়োয়া সেট – দারুণ লাগবে!"

বাপ্পা বললো – "যার যেদিকে মন!"

রাজ বাংলা ভালোই বুঝতে পারে, বলেও ভাঙা ভাঙা।

হাসতে হাসতে বললো – "দাদা, তার মানে বুঝছেন? আপনাকে ভি ভাবীর জন্যে সব্যসাচী লেহঙ্গা নিতে হোবে। .... ননদ কী শাদি বলিয়ে কথা!"

হাসিঠাট্টায় ঘরের আবহাওয়া হাল্কা হয়ে উঠলো।

বাপ্পার বুকের ভেতরের বোঝাটাও বোধহয় হাল্কা হলো একটু।

রাত্রে ঘরে শুতে এসে বাপ্পার মনে হলো মা-ও যেন হাসছে ছবির ভেতর থেকে। ....

বাপ্পার দিকে তাকিয়ে যেন বলছে – "আমি এবার চলি, তোমরা সবাই ভালো থেকো।"

(সমাপ্ত)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

স্বর্ণালী সাহা

কলকাতার কেক বিলাস

শীত এলেই নানারকম খাবারের কথা মনে আসে । এইসময় কলকাতায় কেক ও মোয়ার ভূমিকা অন্যতম । কেক ও মোয়া কে জিতবে – এই নিয়ে শীতের মরশুমে প্রতিবার লড়াই জমে ওঠে । এখানে কেক নিয়ে দু-চার কথা বলি ।

সারাবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেকের আয়োজন পাঁচ ও তিন তারা রেস্তোরাগুলি করে থাকে। তবে বড়দিন বা ক্রিস্টমাস উদযাপনে এইসব রেস্তোরাগুলিই আবার সিনেমার তারকাদের সঙ্গে নিয়ে কেক মিক্সিং-এর আয়োজন করেন। কেক তৈরির যাবতীয় উপকরণ ময়দা, চিনি, ডিম, ড্রাই ফলের সমন্বয়ে বড় করে এই অনুষ্ঠান পালন করে বড়দিনের দামামা বাজে শহরে ।

সেইরকমই অতিসম্প্রতি প্রস্তুতি শুরু হল স্পেশালিটি গ্রুপের ড্যারিয়েল বেকারী ও কনফেকশনারিতে কেক মিক্সিং অনুষ্ঠান। ছোট থেকে বড় অসংখ্য হাতে মেশানো হল আড়াইশো কেজি ড্রাই ফল, বিভিন্নরকম মশলা ও ফলের রস । পায়ে পায়ে এইভাবে বড়দিনের দিকে এগোচ্ছি আমরা। তবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে মনে হচ্ছে বড়দিন এসেই গেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই কেক মিক্সিং অনুষ্ঠানটি খুবই আনন্দের বিষয়, তারা নিজের হাতে এটি করতে পেরে মনে করছে তাদেরও কেক তৈরিতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে ।

কেক মিক্সিং অনুষ্ঠানটি কিছু শতক আগেও ইউরোপে পারিবারিক আচার হিসেবে দেখা যেত, যা বর্তমানে মুখ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্বের সঙ্গে কলকাতাতেও। গত দু-বছর অতিমারীর কারণে খুবই ছোট করে এই কেক মিক্সিং অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছে ।

আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে ওঠাতে কলকাতার পাঁচতারা রেস্তোরাগুলি যেমন যে ডাব্লিউ ম্যারিয়ট, নোভোটেল-এর মতো সংস্থা এবছর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার কাফু, গায়িকা আকৃতি কাক্কর এবং পরিচালক সত্যজিৎ সেন-কে এই কেক মিক্সিং অনুষ্ঠানে ।

ছোট বেকারীগুলি চারবছর থেকে চোদ্দ বছরের বাচ্চাদেরও এই বড়দিনের মরশুমে কেক, কুকিস কিভাবে বানাতে হয় তারজন্য প্রশিক্ষণও দিচ্ছে । সবাই নিজের ইচ্ছাতে তাতে যুক্ত হচ্ছে এই কেক তৈরির মরশুমে আনন্দের সঙ্গে ।

কলকাতার মানুষরা যেকোনো উৎসবকেই আপন করে নেন। দূর্গা পুজো, কালী পুজো কাটতে না কাটতেই এসে উপস্থিত হয় ক্রিস্টমাস বা বড়দিন, যা বাঙালীদের কাছে অন্য অনেক উৎসবের মতোই জনপ্রিয়। এই উৎসব মরশুমে বাঙালীর কেক খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে ।

ক্রিস্টমাসের কিছুদিন আগে থেকেই নানান কেকের বাহার দেখতে পাওয়া যায় কেকের দোকানগুলিতে। বেকারীদের ব্যস্ততা এই সময় তুঙ্গে। বড়, মেজো, সেজো, ছোট অনেক আয়তনের কেক বানিয়ে ক্রেতাদের রীতিমতো তাক লাগিয়ে থাকেন বেকারী মালিকরা ।

ছোট ছোট বেকারীর হাতে কেকের যাবতীয় উপকরণ যথা ময়দা, চিনি, মাখন, ডিম, ড্রাই ফল পরিমান মতো তুলে দিলেই তারা কেক বানিয়ে দেন। কলকাতার এন্টালি বাজারের কাছে "ডালিয়া", "রোজ"-এর মতো কেক কারখানা তথা বেকারীগুলির কাছ থেকে স্বল্প দামে কেক সহজেই পেতে পারেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের জন্য এইসব কারখানাগুলি বেশি পরিমান কেক স্বল্প সময়ের মধ্যে বানিয়ে থাকেন ।

"সালডান" কেক প্রতিষ্ঠান ও কারখানা পরিচালনা করেন পিতা-কন্যা যৌথভাবে। সেইরকমই হরেকরকম কেকের পসরা দেখতে পাওয়া যায় কলকাতার কেনাকাটার প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেটের "নাহুম এন্ড সন্স"-এ । যা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯০২ সালে এক পার্সির হাত ধরে। এখনো সেই ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। সারাবছর তো বটেই বড়দিনের সময়ও ওদের ব্যস্ততা কম থাকে না। রীতিমতো লাইন দিয়ে ক্রেতারা এইসময় কেক কেনেন। প্লেন কেক, প্লাম কেক, স্মার্ট কেক, ক্রিম কেক, ব্রেড বা মশলা পাউরুটি, গার্লিক পাউরুটি, প্যাটিস – এই প্রতিষ্ঠানের খুব জনপ্রিয় জিনিস ।

এছাড়া ফ্লুরিস, মিও আমোরে, ক্রিমস, ক্যাথলিন, সুগার এন্ড স্পাইস, মনজিনিস-এর মতো নামী-দামী প্রতিষ্ঠানগুলিও নানান কেকের সম্ভার যেমন রাখেন, তেমনই আবার যারা নিরামিষাশী তাদের জন্য ডিমবিহীন অর্থাৎ এগলেস কেকও বানিয়ে থাকেন ।

জন্মদিনে কেক অপরিহার্য। যেটা ছাড়া জন্মদিনের কথা এখন মানুষজন প্রায় ভাবতেই পারেন না। বাঙালীরাও পায়েস-এর কথা মাথায় থাকলেও কেক-কেই জন্মদিনে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন । সম্প্রতি কেকের আদলে সন্দেশ বানানোর নজিরও কলকাতার মিষ্টির দোকানগুলোতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ।

বিবাহ, বিবাহবার্ষিকী, বিবাহের বাগদান বা এনগেজমেন্ট এইসব অনুষ্ঠানেও কেকের জায়গা দিনে দিনে পাকা হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র জন্মদিনই নয়, অন্যান্য অনুষ্ঠানেও কেকের মর্যাদা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অনেক কোম্পানি আবার রেডিমিক্স কেক পাউডারও বানাচ্ছেন, যা দিয়ে সহজেই আমরা কেক তৈরী করে থাকি ।

কলকাতাতে বড়দিন বা ক্রিস্টমাস পালনের মহিমা চোখে পড়ার মতো। এরসঙ্গে হরেকরকম কেকের সম্ভার যেন স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দেয় এই উৎসবে। তাই সহজেই বলা যায় "কেকের আমি কেকের তুমি কেক দিয়ে যায় চেনা" ।

স্বর্ণালী সাহা – বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া । পেশায় স্কুল শিক্ষিকা । নিয়মিত কলকাতার উপর প্রবন্ধ লেখা ওনার শখ ।

মহুয়া সেনগুপ্ত

অন্নপূর্ণার হেঁশেল

রান্না করতে আমার ভালো লাগে। মন খারাপে রান্না ওষধির কাজ করে, ব্যথায় অনুলেপের মতন। এর একটি সৃষ্টিশীল শৈল্পিক দিক ছাড়াও নিজস্ব এক দর্শন আছে। রান্না তাই, ছবি আঁকা বা কবিতা লেখার মতনই সৃষ্টিকর্ম।

আমি যেখানে থাকি সেখানে কিছু মারোয়ারি দোকানে ভালো মিষ্টি পাওয়া গেলেও বাঙালি ছানার মিষ্টির আকাল আছে। পিঠে পুলির পাশাপাশি বাড়িতে সখে মিষ্টি বানাতেও ভালো লাগে এখন। পান্তুয়া, গোলাপজাম, ছানার জিলিপি থেকে লবঙ্গলতিকা, বালুসাই, জিভে গজা হয়ে সন্দেশ, রসগোল্লা এ সবই বাড়িতে বানিয়েছি ইচ্ছে হলে। তিনটি মিষ্টির কথা বলবো আজ, সেগুলি বানানোয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন যাঁরা, তাঁদের থেকে শেখা। ঠিক হাতে ধরে শেখাননি কেউই তবে গন্ধের মতো স্বাদেরও তো স্মৃতি থাকে। স্মৃতি থেকেই আমার কিঞ্চিৎ ইম্প্রোভাইজড তিন ভিন্ন প্রদেশের রান্না।

দিদিমার থেকে শেখা পেরাকি বা গুজিয়া। ময়দা আর অল্প চালগুড়ি ঘিয়ে ময়াম দিয়ে লুচির মতো বেলে ভেতরে নারকেল ক্ষীরের ছাঁচ বা পুর দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে গড়ে নিন। এরপর সাদা তেল বা ঘি দিয়ে ভেজে চিনির রসে ফেলতে হয়। পরে জেনেছিলাম পোল্যান্ড ও রাশিয়াতেও এই রান্নার চল আছে। পুর ভরা ময়দার পিঠে, তা সে পুর টক sauerkraut বা ঝাল মাংসেরই হোক আবার ব্লুবেরি, নাটস্ দেওয়া মিষ্টিই হোক। নামটিও কাছাকাছি। পীরোগি। Pierogi is actually the plural form of the word pieróg, a generic term for filled dumplings. গোটা ইউরোপে নানা ধরণের পাই (pie) আছে, তারই জাতভাই। মূলত পোলিশ খাবার হলেও রুশ দেশেও এর চল আছে।

পেরাকির মতন ভাঁজ না করে অন্যরকম ভাঁজে বানিয়ে ফেলা যায় লবঙ্গলতিকাও। শুধু একটি লবঙ্গ গেঁথে ভাঁজটি আটকে রাখতে হয়। বাকি প্রক্রিয়া এক রকম।

দ্বিতীয়টি আমার মা বানাতেন পাউরুটি বা ব্রেড দিয়ে। একরকমের ব্রেড পুডিং। মুঘলাই রান্না, বলা হয় বাবরের জমানায় এ দেশে তার উদ্ভব। রুটি তিন কোণা করে কেটে ঘিয়ে ভেজে নিয়ে চিনির রসে দিয়েই তুলে ফেলতে হবে। এবার

দুধ জাল দিয়ে ঘন করে, চিনি, গোলাপ জল ও জাফরান দিয়ে ক্ষীর বানিয়ে ঐ রসসিক্ত ভাজা রুটির ওপর দিয়ে দিন। এলাচ গুঁড়ো, কাজু, কিসমিস, পেস্তা, বাদাম কুচি দিয়ে গার্নিশ করে দিন। দু এক স্ট্র্যান্ড জাফরানও চাইলে সাজিয়ে দিতে পারেন। তৈরি আপনার শাহী টুকরা বা ডবল কা মীঠা, লখনউয়ের মিষ্টি।

তৃতীয়টিতে আমার শ্বশুরমশাই সিদ্ধিলাভ করে ছিলেন। সেটি বাঙালির চিরাচরিত রসমালাই।

(রসমালাই আর ছানার জিলিপির রেসিপি আলাদা করে দেওয়া রইল।)

ছানার জিলিপি

উপকরণ:

(৪ জনের জন্য)

১) জিলিপির জন্য:

ছানা – ২০০ গ্রাম

ময়দা – ২ চা চামচ

সুজি – ১ চা চামচ

চিনি – ২ চা চামচ

খাবার সোডা – ১/৪ চা চামচ

২) রস বা সিরার জন্য

চিনি – ১ কাপ

জল – ১.৫ কাপ

ছোট এলাচ – ২-৩ টি

ঘি – ১ টেবিল চামচ

প্রয়োজন অনুযায়ী সাদা তেল

প্রণালী:

একটি পাত্রে ছানা, ময়দা, সুজি, অল্প চিনি, খাবার সোডা, অল্প ঘি দিয়ে ভালো করে মেখে একটি ডো বানিয়ে নিন। দেখবেন যেন কোন লাম্প না থাকে। কড়াইয়ে ডুবো তেলে বাকি ঘি দিয়ে গরম হতে দিন। ডো থেকে লেচি কেটে, সেই লেচি দিয়ে লম্বা লম্বা দড়ির মতো করে পেঁচিয়ে জিলিপির শেপ দিন। জিলিপি গড়া হয়ে গেলে মাঝারি আঁচে লাল লাল করে ওগুলি ভেজে তুলে রাখুন।

এবার অন্য একটি পাত্রে চিনির রস বা সিরা করার জন্য ১কাপ চিনির সাথে ১.৫ কাপ জল আর ২-৩ টি গোটা এলাচ দিয়ে ফুটিয়ে রস তৈরি করে নিন। ভেজে তোলা জিলিপি রসে দিয়ে ১ ঘন্টা মতো রেখে দিন। তারপর রস থেকে তুলে এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ছানার জিলিপি।

রসমালাই

উপকরণ:

১) রসগোল্লার জন্য:

দুধ – ১ লিটার

ভিনিগার – ৪ টেবিল চামচ

জল – ২ কাপ

খাবার সোডা – ১/৪ চা চামচ

সুজি – ১ চা চামচ

এলাচ গুঁড়ো – ১/৪ চা চামচ

চিনি – ১ কাপ

২) মালাই তৈরির জন্য:

দুধ – ৬ কাপ

চিনি – ১/২ কাপ

কন্ডেন্সড মিল্ক – ১ টেবিল চামচ

গোলাপজল – ১ চা চামচ

প্রণালী:

দুধ ফুটে উঠলে ভিনিগার দিয়ে ছানা বানিয়ে নিন। ছানা আলাদা হয়ে গেলে কাপড় বা ছাকনিতে ঢেলে জল ঝরিয়ে ঠাণ্ডা করে নিন। চিনির সঙ্গে জল মিশিয়ে রস বা সিরা তৈরি করে মৃদু আঁচে রাখুন। ছানার সাথে সুজি, এলাচ গুঁড়ো, খাবার সোডা, ১ চা চামচ চিনি মিলিয়ে হাত দিয়ে মেখে নিয়ে গোল করে গুলি তৈরি করুন। সব ছানার গুলি এবার রসের মধ্যে দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে ২০-২৫ মিনিট ঢেকে ফোটান। রসগোল্লা উপরে ভেসে উঠলে একটি বড় বাটিতে রসগোল্লা ৭-৮ ঘণ্টা ঐ রসেই ভিজিয়ে রাখুন।

মালাইয়ের জন্য দুধ জ্বাল দিয়ে অর্দ্ধেক হলে চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। খেয়াল রাখুন যেন সর না পড়ে। কন্ডেন্সড মিল্ক দিন। এবার একটি বড় পাত্রে ঘন হয়ে আসা দুধ ঢেলে তাতে গোলাপজল দিন। রস থেকে রসগোল্লা তুলে ঐ মালাইয়ে ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পেস্তা কুচি দিয়ে গার্নিশ করুন। রসমালাই তৈরি!

মহুয়া সেনগুপ্ত – জন্ম উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে। বড় হয়ে ওঠা হুগলি শহরে। শিক্ষা অক্সিলিয়াম কনভেন্ট, ব্যান্ডেল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শারীরবিদ্যায় স্নাতক। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি। পেশা অধ্যাপনা ও গবেষণা। বর্তমানে, ভারতের আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরে বায়োটেকনোলজি বিভাগে কর্মরত। ছ'টি কাব্যগ্রন্থ, এ আমার ছায়াজন্ম (পরম্পরা প্রকাশন, ২০০৯), চিরহরিৎ গাথা (সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৮), তারামাছ নাকছাবি (বইওয়ালা বুক ক্যাফে, ২০২০), বৃষ্টিদ্বীপের কবিতা (পরম্পরা প্রকাশন, ২০২১), প্রেমের কবিতা (সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০২১) ও উনিশ বসন্তের নির্জনতা (কমলিনী প্রকাশন, ২০২২) এখনও অবধি প্রকাশিত। সখ, বই পড়া, গান শোনা, রান্না করা।

বাতায়ন প্রকাশনা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হল দুটি বই। দুজনেই প্রবাসী লেখক।

সুজয় দত্তের **"এক বাক্স চকোলেট"** নানা স্বাদের গদ্যরচনার একটি সংকলন। আমেরিকার ওহিও রাজ্যের ক্লীভল্যান্ড নিবাসী সুজয়ের লেখায় বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা ও দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অম্লমধুর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে যা পাঠকদের আকর্ষণ করে তা হল লেখকের আন্তরিকতা আর সততা।

সিডনিবাসী সঞ্জয় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কবিতার বই **"ধুলো রংয়ের বিকেল"**। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **"মেঘযাপন"** এর থেকে ভিন্নধর্মী কবিতার সংকলন। কবি যে কবিতার আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার প্রতিফলন এ বইতে। বইয়ের নামের মতোই কবিতাগুলিতে এক আলোআঁধারিময় কাব্যধর্মিতা।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

আমরা থাকছি কলকাতা বই মেলা - ২০২২ – বাতায়ন স্টলে । আমাদের সব বই স্টলেতেও পাওয়া যাবে ।

এক বাক্স চকলেট

সুজয় দত্ত

ধুলো রংয়ের বিকেল

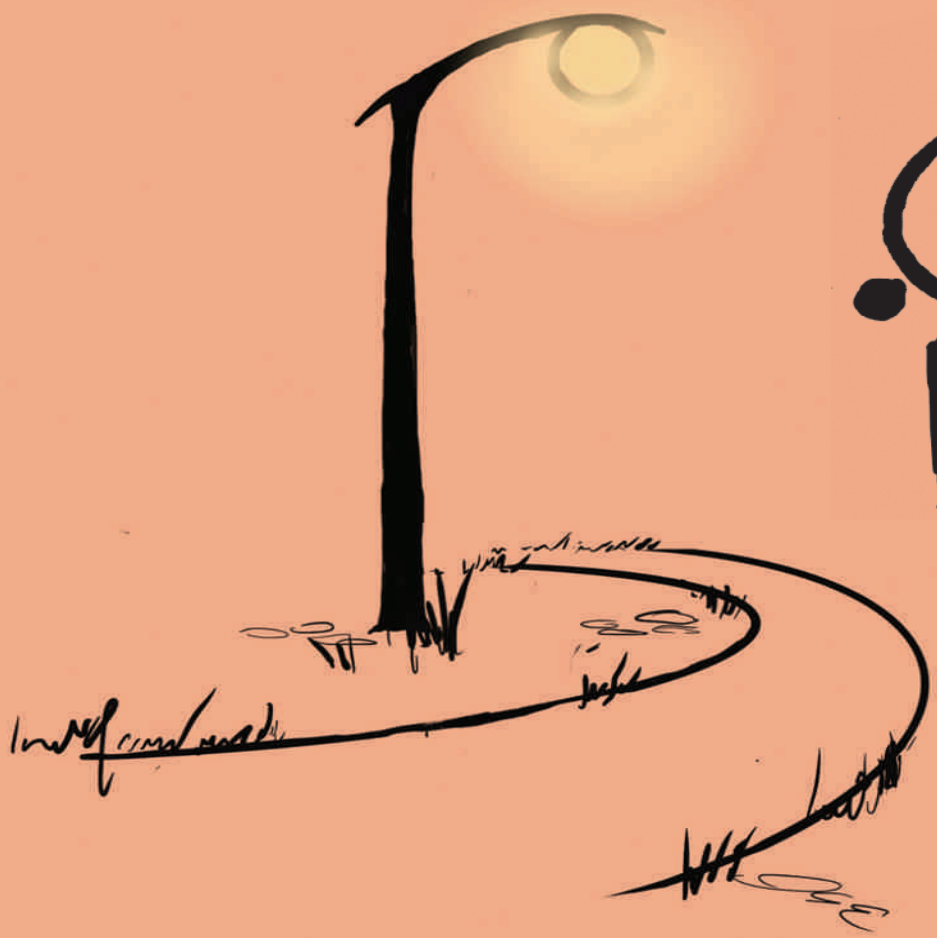

সঞ্জয় চক্রবর্তী